পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী

লেখক

বৈকম মুহম্মদ বশীর

অনুবাদ

নিলীনা আব্রাহাম

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-2958-8

1973 (শক 1895)
নতুন অক্ষরবিন্যাসে তৃতীয় মুদ্রণ : 2000 (শক 1921)

Original Title : Pathummayude Adu and Balyakala Sakhi(Malayalam)
Bangla Translation : Patummar Chhagal O Balya Sakhi
মূল্য : **30.00** টাকা
নিদের্শক ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

পাতুম্মার ছাগল

ভূমিকা

'পাতুম্মার ছাগল' এই বাস্তব কাহিনীটি লিখেছেন এক মূর্খ, অজ্ঞানী, অবিবাহিত যুবক (অবিবাহিতদের মধ্যে জ্ঞানী লোক নেই)। এই বইয়ের ভূমিকার লেখক কিন্তু সদ্য জ্ঞান লাভ করা এক পতি (পত্নীদের জয় হোক)। বিশেষ কিছু খবর দেবার নেই, সুখে আর শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি বলতে পারলেই ভালো হত কিন্তু সুখও নেই. শান্তিও নেই।

কারণ আমি একটা বাড়ি তৈরি করছি।

*   *   *

ওঃ বাড়ি করার কাজ আর এমন একটা কি! বাড়ি একটা করে ফেললেই হয় এমনি মূর্খ লোকেরা বলে। বেচারারা! তারা কিছুই জানে না। তা হলে শুনে রাখুন সবাই। জ্বলজ্যান্ত একটা বউ রয়েছে (বরেরা সত্যিই ভাগ্যবান) কিন্তু বাস করার বাড়ি নেই। বিছানাপত্র বইখাতা থালাবাসন নিয়ে এখানে সেখানে আর কদিন কাটানো যায়? বাস করবার একটা বাড়ি কি করা যায় না?

ঠিক আছে। বাড়ি একটা তৈরি করেই ফেলব। ঠিক করতে কিন্তু বেশি সময় লাগল না, তবে জায়গা? জায়গা কোথায়? বাড়ি করার জন্যে জায়গা চাই না?

*   *   *

কন্যাকুমারী থেকে দিল্লি অবধি সোজা রাস্তা চলে গেছে। শুধু দিল্লি কেন খোদার আশীর্বাদে এ রাস্তা যতদূর খুশি যেতে পারে। এমনি সুন্দর একটা রাস্তার সমান্তরালে একটা সাদা তোয়ালে বিছোনো রয়েছে ভেবে নিন। তোয়ালের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে তাও ভেবে নিন। তোয়ালের মাঝখান থেকে উত্তরভাগ অবধি পুড়ে গেছে ভেবে নিন অর্থাৎ ভালো কথায় বলতে গেলে বিরাট একটা গর্ত অর্থাৎ এখান থেকে বাড়ি তৈরী করার ল্যাটারাইট পাথর সব কেটে নেওয়া হয়েছে তাই এত বড়ো একটা গর্ত।

তোয়ালের দক্ষিণ দিকটাও তো আছে। সেদিকটা পাঁচ ফুট নীচু অর্থাৎ তোয়ালের পরের বাকী ভাগটা সব নীচু ধানক্ষেত। মাইলের পর মাইল ধানক্ষেত।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে সব সময়।

আমাদের তোয়ালে বারো সেণ্টিমিটার জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে চারটি ছোটো নারকেল গাছ। যদি আগের বছরগুলোর হিসেব দেখা যায় তা হলে বছরে ৩৬৫টা নারকেল পাওয়া যাবে।

তোয়ালের যে জায়গাটা পুড়ে যায় নি সেটা একটু নোংরা কালো বলে মনে করুন অর্থাৎ ছোটো ছোটো অনেক পাথরের টুকরো এখানে জড়ো হয়ে আছে। খুঁড়লে খুব ভালো পানি পাওয়া যাবে। বাড়িটার আশেপাশের ব্যাখ্যা সব দিলাম। চারদিকে দেয়াল তুলতে হবে। জায়গাটাকে সমান করা হল। বাড়ি তৈরী হচ্ছে, কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে, সত্যিই কী ভাগ্য। পানি পাওয়া গেল খুব শীঘ্রি। পরিষ্কার পানি। সব এমনি করে ভালোভাবে এগিয়ে যাক্—খোদার আশীর্বাদে।

* * *

কোনো কিছুতেই অসুবিধে নেই, চার লক্ষ টাকা কি পাওয়া যায় নি? মিছিমিছি কি আর কেরালাতে বিরোধীপক্ষ গোলমাল করে? একেবারে খাঁটি কথা। অনেকদিন আগে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম 'নানার হাতী'। তা ছেপে বেরোতেই দুটি খুব বিশেষ ঘটনা ঘটল। প্রথমত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বই বলে কংগ্রেস সরকার পাঁচশো টাকা এবং আরও কী কী যেন পুরস্কার বইটিকে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত বইটি কম্যুনিস্ট ভাবধারার বিরুদ্ধে বলে কম্যুনিস্ট পার্টি ঐ বইয়ের মুক্তকণ্ঠে নিন্দে করতে লাগল। খুব বেশি করে যিনি বইটির বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন তিনি কম্যুনিস্ট মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন। এরপর এই বইটা এম. পি. পল পুরস্কার পেল। এরও পরে বইটা ভারতবর্ষের চৌদ্দটা না আঠারোটা ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমী বেছে নিলেন। যদিও এর বিশেষ কিছু মূল্য নেই তবুও কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমীর প্রেসিডেণ্ট তখন শ্রী জওহরলাল নেহরু। কিছুদিন পরে কেরালায় কম্যুনিস্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হল। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না অনেক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'নানার হাতী'কেও একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রাখা হল। অবশ্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নয়। (পরম শ্রদ্ধেয় পরশুরাম কেরালা সৃষ্টি করার পরই প্রথম মুখ্য ঘটনা হচ্ছে এটা অর্থাৎ একজন মুসলমানের লেখা বই স্কুলের ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক করার মতো অদ্ভুত ঘটনা। এটা অবশ্য করেছেন কম্যুনিস্ট সরকার। হ্যাঁ, সমস্ত ঘটনার গুরুত্বটা বোঝা উচিত। আরও অসংখ্য বইয়ের কথা সুবিধেমত ভুলে গিয়ে এই বইটার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করো)। এমনিভাবে সকলে 'নানার হাতী'র বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ শুরু করল।

* * *

একটা সত্যিকথা এখানে বলি। 'নানার হাতী'কে পাঠ্যপুস্তক করার জন্য আমি কারুর হাতে পায়ে ধরি নি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ছিলাম। সরকারের নির্দেশ আসার পর বইটিকে পাঠ্যপুস্তক না করার জন্য আবেদন জানিয়ে সরকারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, কারণ গভর্ণমেণ্টের শর্ত ছিল বইটাকে দু-টাকা থেকে দেড় টাকায় কমাতে হবে। সরকারকে ২৫% কমিশন দিতে হবে। যদি আমি রাজী হই তা হলে সরকার ৭০,০০০ কপি ছাপাবে। আমার তাতে সম্মতি

ছিল না। কারণ দু-টাকা দরে বইয়ের সাতটা সংস্করণ বেরিয়েছে আর কাগজেরও ভীষণ দাম। আমার এতে খুব ক্ষতি হবে বলে মনে হল। তবে শ্রী কারুর নীলকণ্ঠ পিল্লের পীড়াপীড়িতে সম্মতি জানিয়ে সরকারকে উত্তর দিলাম। কোট্টায়েমের সাহিত্য প্রবর্তক সমবায় সমিতি এই বইটা প্রথম থেকেই প্রকাশ করছে। এইরকম একটা লেখকদের সমবায় সমিতি পৃথিবীতে প্রথম বলে মনে হয়। ভারতে তো প্রথমই। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন শ্রীপিল্লে। বইয়ের কত কপি বিক্রি হল তা মাননীয় কম্যুনিস্ট সরকার অথবা শ্রীপিল্লেকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

* * *

হ্যাঁ, যা বলছিলাম এই বইয়ের বিরুদ্ধে যা তা প্রচার শুরু হল। ক্যাথলিকেরা এই বইয়ের বিরোধিতা করবে বলে আমার কোনো কোনো বন্ধু বলেছিল। কেন করবে তার কারণটা জানি না। যা হোক, সকলে এই বইয়ের পেছনে লেগেছিল। ক্যাথলিক কংগ্রেস, পি. এস. পি. কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সকলে। কাগজে যা দেখলাম তা যদি সত্যি হয় তা হলে সকলে যথেচ্ছ মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হল। আমি একজন পুরোনো কংগ্রেস কর্মী, পুলিশের হাতে অনেক মার খেয়েছি। অনেকবার জেলেও গিয়েছি। কংগ্রেস বললেই গান্ধীজি, ভারতের স্বাধীনতা এইসব কথাই মনে পড়ে। অহিংসা আর সত্যের প্রতিমূর্তি কংগ্রেসের এতখানি অধঃপতনের দরকার ছিল না। এই বই আমি আট আনায় বিক্রি করেছি বিধানসভায়, কংগ্রেস সভ্যেরা বলেছেন তা আমি কাগজে পড়েছি। এই ডাহা মিথ্যে কথা বলার দরকার কংগ্রেসের ছিল না। আমি আগেই বলেছি যে এই বই সাহিত্য প্রবর্তক সমবায় সমিতি প্রকাশ করেছিল। এই সমিতি আমাকে সাতটা সংস্করণের দু-টাকা দামের ওপর রয়ালটি দিয়েছে। বইয়ের দাম এবং অন্যান্য বিষয়ে যাঁদের একটু জ্ঞান আছে সেই শ্রীপিল্লে, শ্রীরামন নায়ার, শ্রী পি. কেশব দেব এই সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁদের বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত করার ইচ্ছে আমার নেই। একটা ভোট বেশি পেলেই আমি সর্বজ্ঞানী হয়ে যাব এরকম ধারণা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।

প্রতিপক্ষ আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বলে কাগজে অভিযোগ করেছে। খুব ভালো কথা। কাগজে আরও দেখলাম যে প্রতিপক্ষ বলেছে আমি নাকি ঐ বই থেকে চারলক্ষ টাকা পাব। একটু ভেবে দেখলে মনে হয় এত টাকা দিয়ে আমি করব কি? তাই এই বইয়ের প্রকাশক সাহিত্য প্রবর্তক সমবায় সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা যা খরচ করেছেন তা মিটিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার প্রাপ্য দিয়ে বাকি তিনলক্ষের ওপর টাকা প্রতিপক্ষদের বেঁটে দেবার জন্যে কেরালার কম্যুনিস্ট সরকারের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি।

প্রতিপক্ষদের মঙ্গল হোক।

হে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! এরা কী করছে এরা জানে না। তুমি এদের ক্ষমা করো।

* * *

১৯৪৫ সালের ২৭শে এপ্রিল 'পাতুম্মার ছাগল' এই গল্প লেখা শেষ করেছি। লেখাটার একটু অদলবদল করে একটা ভূমিকা লিখে ছাপাব ভেবেছিলাম। কাল করব, কাল করব করতে করতে কত দিন যে চলে গেল।

পাঁচ বছর!

এতদিন অবধি গল্পটাকে আমি ছুঁই নি। এর আগে যেসব গল্প আমি লিখেছি তার প্রত্যেকটি একবারের বেশি কেটেছেঁটে ঠিক করেছি। এই বইটাই শুধু একবারও পালিশ না করে বার করছি। আমি পড়ে দেখেছি। কাটছাঁট করার বা কিছু বদল করবার দরকার নেই বলেই মনে হয়। এটা একটা মজার গল্প। কিন্তু লেখার সময় আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমার সব ব্যথা ভুলে যাবার জন্যে লেখার শরণ নিয়েছিলাম।

* * *

হ্যাঁ...তখন আমার মন...গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সময়ে ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো। এরকম বললে ঠিক হবে কিনা জানি না। যা হোক্, অন্ধকারে ভয়াবহ স্বপ্নে ভরা ঘন অন্ধকারে মন তখন আমার ডুবে ছিল। আমি নিজেই আমার মন। আলোর রেখা খুব কমই দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে...আলোয়...হে খোদা! আমি কোথায়? সত্য কি? মিথ্যা কি? আলো...আলো...আমার আলো চাই। কিন্তু কোথাও আলো নেই শুধু ভয়াবহ স্বপ্নে ভরা অন্ধকার...চারিদিক থেকে ঝড়ের গর্জনের মতো ভয়াবহ অন্ধকার আমার দিকে তেড়ে আসছে।

চিরদিনের মতো আমি কি এই গভীর অন্ধকারে ডুবে যাব?

না—জীবনকে ভেঙে চুরমার হতে আমি দেব না। ভালো হতে হবে, আমাকে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে হবে। আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার চেষ্টা করতে হবে।

ভালো...হ্যাঁ শুধু ভালোতেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। একাগ্রচিত্ততা...আমার মন শুধু তাতেই বাঁধা থাক্। মন...মন...মন যেন শত শত হাজার হাজার কালো কালো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। এই টুকরোগুলির এক একটায়...আমি কি দেখছি, কি শুনছি।

* * *

যুক্তি যেন আমায় ছেড়ে না যায়। প্রত্যেকটি কার্যের কারণ আছে। সাহস খুব সাহসের সঙ্গে জানার চেষ্টা করতে হবে। অন্ধবিশ্বাস যেন একটা নরম গদি...তাতে যখন আশ্রয় খুঁজছিলাম...এটা কিন্তু সে রকম নয়। যত কিছু বিশ্বাস আমার মর্মস্থলে বাসা বেঁধেছে তার প্রত্যেকটির সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে।

ভালোকে শুধু অভ্যর্থনা জানাও। মন্দ একরকমের রোগ বিশেষ। চিকিৎসা করলে ভালো হবে। সব রোগই ভালো হয়। ভালো হয় না এমন রোগ আছে যারা বলে তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়। অজ্ঞানতার শিকল আমাদের ভাঙতে হবে।

গোলমেলে ভাবনাচিন্তা। নিদ্রাহীন রাতগুলি। কঠিন কাজে ভরা দিনগুলি। রাত্রিকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম, দিনকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম আর সেইসঙ্গে কাজকেও। সবকিছুই ঘৃণা করতে শুরু করলাম। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। শুধু স্বপ্ন। সব মিলিয়ে কি রকম যেন একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি।

কি হল? কি যেন হারিয়ে গেল। উঃ কি কষ্ট। কি সব আবোলতাবোল আমি বকছি।

এর পরেই আমি পি. সি. গোবিন্দন নায়ারের চিকিৎসাধীনে এলাম। এর্ণাকুলামের কৃষ্ণন নায়ার ঘড়ি কোম্পানির মালিক কুট্টপন নায়ারের গাড়িতে ত্রিচুর পৌঁছলাম। গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্বয়ং কুট্টপন নায়ার। গাড়িতে 'নর্মদা' দৈনিক কাগজের স্বত্বাধিকারী শিল্পী রাঘবন নায়ার, এম. পি. স্টুডিয়োর মালিক শ্রী এম. পি. কৃষ্ণ পিল্লে, শ্রী পেরুন্না টমাস প্রভৃতি ছিলেন। বৈদ্যরত্ন পি. সি. গোবিন্দন নায়ার পাগল চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। আমি যখন ওঁর মানসিক হাসপাতালে পৌঁছলাম তখন সেখানে বিশ-ত্রিশজন পাগল ছিল। এদের কারুর হাত বাঁধা, কারুর পা। সকলের একই চিকিৎসা বলে আমার মনে হল।

আমারটা বলছি।

* * *

সকালের চা খেয়ে প্রাতঃকর্ম সেরে হাত-পা মুখ ধুয়ে এসেই মাথায় তেল চাপড়ানো শুরু হয়। খুব ঠাণ্ডা তেল। (একবার নাকি শ্রী পেরুন্না টমাস এই তেল একদিন ব্যবহার করে তিনদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন)। আমার শুশ্রূষা করার জন্য তিনি আমার সঙ্গেই থাকতেন। শুশ্রূষার অন্য লোকও ছিল। শ্রী কে. পরমেশ্বরন নায়ার, এম. এ. কাদের, পি. বাসুদেবন। শ্রী পরমেশ্বরনের ত্রিচুরে একটা ফোটো স্টুডিও আছে। তিনি নিজেও একজন খুব ভালো ফোটোগ্রাফার। তিনি একজন অভিনেতা আর আর্ট ডিরেক্টরও ছিলেন। আমি পরমু বলে ডাকতাম। আমি ছাড়া পরমুই একমাত্র লোক যে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছে।

সে সময় পরমুর প্রধান কাজ ছিল চিঠি লেখা। আমি বলতুম আর পরমু লিখে যেত। অল্প পরিচয়ের লোকদেরও আমি চিঠি দিতাম। মনের ব্যথা ভোলার জন্য এইসব চিঠি লিখতাম। তাছাড়া বইয়ের ভূমিকাও লিখতাম। "ক্ষুধা" আর "জীবন ছায়া' বই দুটোর ভূমিকা এই ভাবে লিখি। সে সময় বেশ মজার মজার অনেক ঘটনা ঘটে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আমার কথাবার্তা, কাজকর্ম সব লিখে রাখার জন্যে আমি পেরুন্না টমাসকে বলেছিলাম। তার জন্যে একটা বড়ো খাতাও কিনে রেখেছিলাম।

দশ-বারো দিনের কথা আমি পড়ে দেখলাম। তারপর সেগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। অনেক মজার কথাও আমি পরমুকে বলেছিলাম। সেসব কথা আমার এখনও বেশ ভালো করে মনে আছে। সব এই ভূমিকায় ঢুকিয়ে দেব ভেবেছিলাম। এর মধ্যে একটা কথা বলে নিই। যেকোনো রোগই ভালো হয়ে যাবে, ওষুধই সব নয়। রোগীর ভালো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা চাই। আমার একশো ভাগ আশা ছিল ভালো হয়ে যাবার। এ বিষয়ে বিশদভাবে এই ভূমিকায় লেখার সময় নেই। (আমি বলছিলাম না যে আমি একটা বাড়ি তৈরী করার গণ্ডগোলে ছিলাম। স্বামীর পোস্টে প্রমোশন পেলাম তাও বলেছি। আমার বউয়ের নাম ফাতিমাবি। তিনি কালিকটের রেরুবান্নুরের কয়াকুট্টি মাস্টারের বড়ো মেয়ে। বউকে আমি ফাবি বলে ডাকি। আমার অসুখের সময় যেসব মজার ঘটনা ঘটেছিল তা সব আমি ফাবিকে শুনিয়েছি। সেসব কথা সময় হাতে এলে বলব)। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম তেলের কথা। তেলটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে বারোটা পাগলা হাতীর মাথায় এই তেল না ঘষে যদি একটা হাতীর মাথায় ঘষা হয় তা হলে বারোটা হাতীই ঘুমিয়ে পড়বে—এরকম আমি শুনেছি। সেই তেল আমার মাথায় ঘষা হয়েছে। তারপর কষায় মুখের মধ্যে ঢালা হল। সে ওষুধও ঠাণ্ডা। হ্যাঁ, তেলটা মাথায় ভালো করে ঢোকার জন্য আধ ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তারপর অবশ্য এই কষায় খেতে হবে। আমি একটা বেঞ্চে সোজা হয়ে শুয়ে আছি আর কষায়ের ধারা কম করে এক ঘণ্টা ধরে আমার মুখের মধ্যে ঢালা হচ্ছে। এরপরের চিকিৎসা দুটোই ভীষণ।

আমি একই ভাবে শুয়ে আছি। সব স্বাভাবিক। মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি। পাখির কিচিমিচি, মোটরের হর্ন শুনতে পাচ্ছি (জায়গাটা জাতীয় সড়কের কাছাকাছি বলে)। সূর্য বেশ ভালো করেই প্রকাশ পেয়েছে। খানিকক্ষণ পরে আমার নাকের ডান ফুটোয় একটা কাঁঠাল পাতার ছুঁচোলো দিকটা থেকে ফোঁটা ফোঁটা তেল ঢালা হচ্ছে। উঃ তেলের কি ঝাঁজ আর গন্ধ। তেল ঢেলে ফুঃ বলে নাকের মধ্যে খুব জোরে ফু দিতেই নাকের ডান ফুটোর সমস্ত তরল পদার্থ, অ্যাটম বোমার মতো ফেটে পড়ল অর্থাৎ নাকের বাঁ দিকের ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে সূর্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মানুষ, পাখি, গাড়ির কোনো কিছুরই কোলাহল শুনতে পাচ্ছি না। শুধু এই পৃথিবী এখনও বাকী রয়েছে। ততক্ষণে নাকের বাঁ ফুটোতেও তেল ঢালা হয়েছে। একটা ফুঃ—সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পৃথিবীতে কিছুই ঘটে নি। আমার মাথার মধ্যে এইসব গোলমাল হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত চোখদুটো দিয়ে বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই সে দুটোর চিকিৎসা এখন শুরু হল। চোখ দুটোয় কী যেন একটা মলম লাগানো হল। নাকে যে তরল পদার্থ ঢালা হয়েছিল তার থেকেও হাজার গুণ ঝাঁজ আর বিশ্রী গন্ধওয়ালা কী একটা

মলম চোখে লাগিয়ে দেওয়া হল। বাঃ এখন আর একটুও দেখতে পাচ্ছি না। কে এক দয়ালু ভদ্রলোক আমার হাত ধরে আমাকে একটা বড়ো মুখওয়ালা তামার চান করার বাসনের কাছে বসিয়ে দিল। তারপর শুরু হল গোসল। ঠিক গোসল নয়, আমার ওপর ধারাবর্ষণ শুরু হল। হিমের মতো ঠাণ্ডা পানি কে একজন খুব সাবধানে ঘটি করে নিয়ে আমার মাথায় ঢালছে। দশ মিনিট ঢাললেই যে কেউ হি হি করে কাঁপবে। আমাকে অন্তত কম করে একঘণ্টা ঢালা হল। কী ভাগ্য তবুও আমি চোখ খুলতে পারলাম, যদিও চোখের জ্বালা আর ধোঁয়াটে ভাব তখনও যায় নি।

* * *

এই একই চিকিৎসা শুরু হবে আবার বিকেল চারটে থেকে। এর মধ্যে আবার কষায়, নানা রকমের বড়ি, কবিরাজী ঘি সব আছে। চিকিৎসার সব চেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল চোখের ওষুধ লাগানোটা। তবে এই মলমের ঝাঁজ আর রুক্ষতা আমি একদিনের মধ্যে কমিয়ে আনলাম। কী করে তা বলছি। চোখে মলম লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ খুলে ফেলি। এর জন্যে চাই কিন্তু অসীম সাহস। দেখিই-না চোখ খুললে কি হয় এই ভাব নিয়ে। প্রায় মিনিট খানেক যদি সাহস করে খুলে রাখতে পারা যায় তা হলে পরে আর বিশেষ কষ্ট হয় না। ঐ এক মিনিটের জন্যে মনের সমস্ত শক্তি আর সাহস চাই। সে সময়ে, পরেও—যারাই আমার কাছে এসেছে তাদের চোখে আমি জোর করে মলম লাগিয়ে দিয়েছি। যাদের যাদের দিয়েছি তাদের নাম আমি নীচে লিখছি। যাদের লাগিয়েছি কিনা সন্দেহ তাদের নামের পরে ব্রাকেটে (সন্দেহ) লিখে রেখেছি। তারা যদি আমাকে ঠিক খবর জানায় তা হলে এর পরের সংস্করণে তাদের নামের পেছন থেকে 'সন্দেহ' কথাটা উঠিয়ে দেব।

কে. পরমেশ্বরন নায়ার, পারেম্মল বাসুদেবন, পেরুন্না টমাস, এম. এ. কাদের, গোপীনাথ পানিক্কর, আর. এস. প্রভু, কে. শতকরন্ নায়ার, সত্যন (ফিল্ম স্টার), রামু কারিয়াট (ফিল্ম ডিরেক্টর), এ. সি. জর্জ (কেন্দ্রীয় ডেপুটি মন্ত্রী), এস. কে. পোট্টেকাট (লেখক), তিকোডিয়ান, পি. ভাস্করন, এন. ভি. কৃষ্ণ ওয়ারিয়র (সন্দেহ), ভি. আবদুল্লা, এম. আবদুর রহিমান, এম. ভি. দেবন (সন্দেহ), এম. পি. কৃষ্ণ পিল্লে, পি. কে. বালকৃষ্ণন, ডি. এম. পোট্টেকাড, কে. এ. রাজন, কোচ্চাপ্পন, জোসেফ মুণ্ডশ্শেরী (সন্দেহ), পোন্নীক্কারা রাফি, ভায়ালার রামবর্মা (কবি), এম. গোবিন্দন (সন্দেহ), এন. কে. ভাস্করন নায়ার, পোরকুন্নম ভার্কী (লেখক), ফাবি বশীর।

এ ছাড়া আরও কয়েকজন স্ত্রীলোকের চোখেও লাগিয়েছি। আমি এখন সাদী করেছি বলে ওদের নাম সব ভুলে গেছি। এত চেষ্টা করেও মনে আসছে না। কিম্ বহুনী!

এমনিভাবে চিকিৎসার সময় 'পাতুম্মার ছাগল' উপন্যাসটি লিখছি। ঘণ্টাখানেক লেখার পর আমি পাগলদের মধ্যে গিয়ে একটা 'ইণ্টারভিউ' নিই। পদ্মনাভন নায়ার

নামে এক পাগল আমার ভীষণ ভক্ত হয়ে উঠল। ও সবসময় আমার কাছাকাছি থাকত। এই পাগলটা আমাকে স্বামীজী বলে ডাকত। তার বিশ্বাস আমি এক ব্রাহ্মণ সন্তান। এক ঘটি শুদ্ধ পানি নিয়ে এসে সে রোজ আমার ঘরে ছিটিয়ে ঘর শুদ্ধ করত। আমি যে দিক দিয়ে হাঁটতাম সে পথও সে পরিষ্কার করত। এক সময় সে ছিল স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত। অনেক সংস্কৃত শ্লোক সে আমায় শুনিয়েছে। তার মাঝে আমার খাওয়া চা নিয়ে খাবে, আমার ফোঁকা বিড়ি নিয়ে ফুঁকবে। দুজন শঙ্করাচার্য ছিলেন। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই আমার কাছে গল্প করবে তারপর জিজ্ঞেস করবে এদের মধ্যে কোন্ শঙ্করাচার্য আমি। আমি বলি—'আমার নাম বৈকম মুহম্মদ বশীর, আমি এক মূর্খ মানুষ'। তা শুনে সে বলে—'স্বামীজী, কেন তুমি নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখতে চাও? ওর আবার চোখে লাগানোর মলমটায় খুব ভয়। তাই ওকে এড়ানোর জন্যে আমি বলতাম—'এসো আমরা একটু চোখে লাগাই—তা শুনেই ও পালিয়ে গিয়ে অন্য কোনো ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করত।

আর একজন পাগল মৌনীবাবা। জাতে খৃশ্চান, বোধহয় ক্যাথলিক। অনেকদিন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করার পর একদিন সে মুখ খুলল। রোজ চারটের সময় ওর চিকিৎসা শেষ হবার পর ও পূবের বারান্দায় গিয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দুবার হাসবে। আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব হবার পর ও ওর জীবনের সব কথা আমাকে খুলে বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

—কী কাজ করতে?

—আমি সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম। পাঁচ বছর আগে সিরিয়ার যুদ্ধে মারা গেছি।

—তারপর?

—এখন ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

কি জন্যে আর আমি জিজ্ঞেস করি নি।

আর একটা পাগল ছিল খুব মোটা। ওর জীবনের একটা বড়ো ইচ্ছে একটা হাতীকে খাওয়া।

আমি বললাম—আমার নানার একটা হাতী ছিল।

—তাকে খেয়েছ?

—না খাই নি। সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তাকে ধরা যাবে?

আমি বললাম—জানি না।

* * *

এমনিভাবে কত যে মজার কথা লেখার আছে কিন্তু সময় নেই। পাতুম্মার ছাগলকে খাঁচা খুলে বার করে দেবার আগে আর একটা ঘটনার কথা বলার আছে। গত নভেম্বর মাসে কালিকট থেকে শ্রী ভি. আবদুল্লা, এম. আবদুর রহিমান আর

তিকোডিয়ান এই তিন ভদ্রলোক তালাওলাপরম্বিলে আমার বাড়িতে এলেন। 'নানার হাতী' বইটি তাঁরা নাটক করতে চান। কালিকটের কলা উৎসবে তাঁরা সেটা স্টেজে নামাবেন।

ঠিক আছে। আমি তাঁদের সঙ্গে কালিকটে গেলাম। বইটির নাট্যরূপ দেওয়া হল—নাটক স্টেজে নামানো হল।

নাটক নাকি খুব ভালো হয়েছিল। আমি অবশ্য দেখি নি কারণ আমি তখন ফাবিকে সাদী করে শ্রী এস. কে. পোট্টেকাডের নতুন বাড়ি 'চন্দ্রকান্ত'য় বউকে নিয়ে মধুযামিনী যাপন করছিলাম।

ভূমিকা শেষ করতে যাচ্ছি। 'পাতুম্মার ছাগল' শুধু মাত্র গল্প নয়। এর সব চরিত্রগুলো এখনও আল্লার দয়ায় বেঁচে আছে। বলেছি পাঁচ বছর আগে আমি এই বইটা লিখেছি। নতুন নতুন চরিত্র কিছু এসে গেছে। এ গল্প আমার বাড়ির গল্প মনে রাখতে হবে। তাই লেখার সময় কিছু কিছু ঘটনা আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। তাই মনে করিয়ে দিয়ে 'পাতুম্মার ছাগল'কে তার খাঁচা খুলে আপনাদের কাছে ছেড়ে দিচ্ছি।

সকলের শুভ কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

বৈকম মুহম্মদ বশীর

পাতুম্মার ছাগল

পাতুম্মার ছাগল অথবা মেয়েদের বুদ্ধি এই গল্প আমি লিখতে বসেছি।

বেশ কিছুকাল একা একা কাটিয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরে অনেক দিন পরে আমি বাড়ী ফিরলাম। বাড়ীতে আসায় সকলেই খুব খুশী হলো কিন্তু বাড়ীতে এসে সব কিছু দেখে আমার ভীষণ রাগ হলো। বসে বসে আমি জ্বলতে লাগলাম। আমার বাড়ী...আমি কাকেই বা দোষ দিই?

আজ প্রায় দশ পনের বছর হ'লো আমি বাড়ীতে নেই। কখনো-সখনো দু-এক রাত হয়তো কাটিয়েছি। আমার নিজের থাকার জন্য বসতবাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে সদর রাস্তার একধারে টালি দেওয়া একটা ছোট বাড়ী আমি তৈরী করেছিলাম। বাড়ীটা করবার সময় আমি নিজেও অনেকবার তার ইঁট,পাথর, চুন, সিমেণ্ট বয়েছি। বাড়ীটার জন্যে অনেক কষ্ট করেছি শুধু একটু ভালো ভাবে থাকার জন্যে। শুধু মনের একটু শান্তির জন্যে। উঠোনে সাদা বালি ছড়িয়ে চারিদিকে খুব সুন্দর সুন্দর গাছ পুঁতেছি। বেলফুল আর যুঁইফুলের লতা লাগিয়েছি। কাছেই দুটো পুকুর, একটা পানি খাওয়ার জন্যে আর একটা গোসল করার জন্যে। আমার জন্যে আলাদা একটা পায়খানাও আছে। বাগানে নারকেল আর কলার গাছ। এ ছাড়া অনেকগাছ আমি পুঁতেছি বিশেষ করে কতকগুলো আম গাছ। রাস্তার ধারের দিকে কয়েকটা আনারস গাছও পুঁতেছি। উঠোনের চারিদিকে ছ-ফুট উঁচু বেড়া দিয়েছি। সামনে গরাদ লাগানো গেট। রাস্তায় যেতে যেতে লোকেরা আমার গাছগুলো আর ফুলগুলো ঈর্ষাভরে দেখতে দেখতে যায়।

এই বাড়ীতে আমি একেবারে একলা থাকতাম। চা, জলখাবার আমার আম্মা গেটের ওপর থেকে আমার হাতে চালান দিতেন। কাউকেই আমি ভেতরে ঢুকতে দিতাম না। বেশ শান্তিতে বসে কিছু লিখতাম অথবা পড়তাম। যখন লিখতাম না বা পড়তাম না তখন গাছপালা ফুলফলের সেবা করতাম। এমনিভাবে কিছুদিন থাকার পর আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম। শিবগিরি, মাদ্রাজ, এর্নাকুলম, কোয়েম্বাটুর এইসব জায়গায় তিন বছর ঘুরলাম। তারপর শরীরটা খারাপ হওয়াতে বাড়ী ফিরলাম। ফিরে দেখি আমার বাড়ীটা আমার ছোট ভাই আবদুল কাদের ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এক্সাইজ ইন্সপেক্টর শ্রী রামনকুট্টি তাঁর রাঁধার লোকটিকে নিয়ে সুখে বাস করছেন। ভদ্রলোকের আমার বাড়ীটি বড়ই পছন্দ হয়েছে তবে আমার থাকার জন্যে তিনি

বাড়ীটি ছেড়ে দেবেন বললেন। তবে মুশকিল হচ্ছে যে গ্রামে আর একটিও বাড়ী নেই যা ভাড়ায় পাওয়া যায়। এখন কি করা যায়?

অতএব আমাকে আমাদের বসতবাড়ীতে আমার বাড়ীর লোকজনদের সঙ্গে থাকতে হলো। আমার তখন দরকার ছিল পরিপূর্ণ বিশ্রাম। কোনরকম হৈ হৈ হট্টগোলের মধ্যে থাকা চলবে না তাহলে আবার শরীর খারাপ হবে কিন্তু আমাকে একেবারে সবরকম গণ্ডগোল, হৈ হৈ আর উৎপাতের মধ্যে বাস করতে হলো।

নারকেল পাতায় ছাওয়া আমাদের ছোট্ট বাড়ী। তাতে কে যে আছে আর কে যে নেই তা বলাও মুশকিল।

আমার আম্মা, আমার ঠিক পরের ভাই আবদুল কাদের, তার বউ কুঞ্জানুম্মা, তাদের ছেলেমেয়েরা পাতুকুট্টি, আরিফা, সুবেদা, আবদুল কাদেরের পরের ভাইটি হানিফা, তার বউ ঐশম্মা, তাদের ছেলেমেয়েরা—হাবিব মুহম্মদ, লায়লা, মুহম্মদ রশীদ; মুহম্মদ হানিফার পরের বোনটি আনুম্মা তার বর সুলেমান তাদের প্রিয় সন্তান সেয়দু মুহম্মদ আর আমার সবচেয়ে ছোট ভাই আবু বকর।

এতগুলো লোক। এ ছাড়া আমার আম্মার আশ্রিত অনেকগুলি প্রাণী। এরা কোথা থেকে এসে যে জুটেছে তা আল্লাই জানেন। এক গণ্ডা বেড়াল, বেড়ালের ভয়ে সদা ত্রস্ত হয়ে ছুটে বেড়ানো চার গণ্ডা ইঁদুর। বাড়ীর উঠোনে সব সময় চীৎকার করছে কতকগুলো কাক। আম্মার নিজস্ব বিশ তিরিশটি মুরগী, তাদের অসংখ্য বাচ্চা আর এদের ছোঁ মেরে নেবার তালে গাছের ওপর বসে আছ চিল।

বাড়ীতে সব সময় গোলমাল। রশীদ আর সুবেদা এখনও হামাগুড়ি দিতে শেখেনি। দুধ খাওয়ার সময় ছাড়া ওরা সবসময়ই কাঁদছে বিশেষ করে আরিফা—ও আবার হাঁটতে শিখেছে। কান্না যেন ওর জপতপ। এদের সকলের চেয়ে বড় লায়লা আর সেয়দু মহম্মদ ওরাও ভীষণ কাঁদুনে। আবী আর পাতুকুট্টিও কম যায় না। (ওঃ হ্যাঁ হাবিব মহম্মদকে বাড়ীতে ডাকা হয় আবী বলে। ওর স্কুলের নাম হাবিব। হাবিবকে ওর নাম জিজ্ঞেস করলে বলে 'ম্বি'। ও আর পাতুকুট্টি ক্লাশ ওয়ানে পড়ে)। এরা দুজনে শুধু চীৎকার করে কাঁদে না, ভীষণ জেদীও। এই এতগুলো ছেলেমেয়ে তার ওপর মুরগী, বেড়াল, ইঁদুর, কাক, চিল আর বাড়ীর মেয়েরা—সব মিলিয়ে বাড়ীতে যেন সব সময় মেলা বসেছে। আর এই এত গণ্ডগোলের মধ্যে এসে জুটলো আবার একটা ছাগল।

ছাগলটা স্ত্রীবর্গের। রং ঘন বাদামী। খুব চটপটে ছাগল। ছাগলটা সকালবেলায় আমাদের বাড়ীতে এসে রান্নাঘরে ঢুকে ওর সকালের খাওয়া খায়। তারপর বাড়ীর ভেতরে ঢুকে ঘুমন্ত বাচ্চাদের মাড়িয়ে তাদের জাগিয়ে দিয়ে উঠোনে আগের রাতের পড়া কাঁঠাল পাতাগুলো খুব তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে।

উঠোনের একপাশের কাঁঠাল গাছটার বয়স অনেক হয়েছে তবে এখনও কাঁঠাল

হয়। শুধু একটা কেন দশটা ছাগল খাওয়ার পাতা গাছটাতে এখনও আছে। যত তাড়াতাড়ি পারে কাঁঠাল পাতাগুলো খেয়ে ছাগলটা উঠোনের আর একধারের জামরুল গাছটার তলায় গিয়ে উপস্থিত হয়। তলায় পড়ে থাকা সব জামরুলগুলো খেয়ে গাছের ওপরে তাকায়। নরম রোদে ডুবে বড় বড় শিশির ফোঁটার মত সবুজ পাতার আড়ালে জামরুলগুলো দেখা যাচ্ছে। কি করে জামরুলগুলোকে পাড়া যায়? ছাগলটা পেছনের পা দুটোয় ভর দিয়ে নীচের দিকের জামরুলগুলো পাড়তে চেষ্টা করে। নাঃ পাড়া যাচ্ছে না। কে যেন জামরুল গাছের ঝুলে পড়া ডালগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

ওইরকম ভাবে খানিকক্ষণ জামরুল পাড়ার চেষ্টায় হতাশ হয়ে ছাগলটা আবার কাঁঠাল তলায় ফিরে আসে। ততক্ষণে আবার কতকগুলো কাঁঠাল পাতা পড়েছে। ছাগলটা পাতাগুলো মুখে পুরে মনের সুখে চিবোতে থাকে। তখন হয়তো আম্মা, কুঞ্জানুম্মা, ঐশম্মা বা আনুম্মার কেউ উঠোন ঝাঁট দিতে ঝাঁটা নিয়ে আসে। তাই দেখে ছাগলটা ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে যায়।

কার ছাগল এটা? কি অবাধ স্বাধীনতা ওর এখানে! কোথায় না কোথায় ঢুকছে! কি না করছে। তবু কেউ ছাগলটাকে কিছু বলছে না। বাড়ীর লোকে কি বোবা হয়ে গেছে নাকি? কানে যেন সব কুলুপ দিয়েছে। ডাকলেও কেউ শুনতে পায় না।

আমি তখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি হঠাৎ ঘরের মধ্যে কাগজ ছেঁড়ার শব্দ পেলাম। আমি দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই দেখি ছাগলটা বিছানায় উঠে আমার বই খাচ্ছে।

স্যুটকেশের ওপর 'বাল্যবন্ধু' আর 'শব্দ' এই বই দুটোর নতুন সংস্করণের দুটি কপি ছিল। তার মধ্যে 'বাল্যবন্ধু' বইটা ছাগলটা খাচ্ছে। সামনের পা দিয়ে চেপে ধরে দুটো তিনটে পাতা ছিঁড়ে একসঙ্গে মুখে পুরছে। খাক্। 'শব্দ' বইটা এখনও রয়েছে। এটা খাওয়ার সাহস নিশ্চয়ই হবে না।

নাঃ ছাগলটার সাহসের অভাব নেই দেখছি। 'বাল্যবন্ধু' শেষ হয়ে গেলে পর 'শব্দ' বইটার দিকে এগুলো। দু-মিনিটের মধ্যে সেটাও শেষ করলো। তারপর আমার গায়ের ঢাকাটার দিকে এগোতেই আমি লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

—হে অজসুন্দরী! দয়া করে ঐ ঢাকাটা খেও না। ওর দাম পঞ্চাশ টাকা। ওর আর একটা কপিও আমার কাছে নেই। আমার লেখা আরও অনেক বই আছে তা আমি তোমাকে এনে দেবো। তার জন্যে এক পয়সাও নেব না।

ছাগলটাকে আমি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলাম। ছাগলটা এক দৌড়ে কাঁঠাল গাছটার তলায় গিয়ে হাজির হলো। সেখানে কটা পাতা পড়ে রয়েছে দেখে শ্রীমতী তা খেতে আরম্ভ করলো।

আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা কার এই ছাগলটা গো?

—আমাদের পাতুম্মার ছাগল।

—ওঃ তাই বুঝি এটার এত স্বাধীনতা?

পাতুম্মার ছাগল...এবার সব বুঝতে পারলাম। সকাল হবার আগেই পাতুম্মা ছাগলটার বাঁধন খুলে দেয় তারপর ছাগলটাকে শিখিয়ে দেয়, যা ওরা উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার আগে পেট ভরে পাতা খেয়ে নে।

ছাগলটা ওর উপদেশ মতো সোজা আমাদের বাড়ী ঢুকে ওর বজ্জাতি শুরু করে।

ছাগলের মালিক পাতুম্মা আমার বোন। আবদুল কাদেরের ঠিক পরেই। দেড় ফার্লং দূরে বাজারের পেছনে ওর বাড়ী। সকাল বেলায় ওর কর্ত্তা কোচ্চুন্নীকে চা আর খাবার খাইয়ে কাজে পাঠিয়ে দেয়। কাজ মানে ব্যবসা। কোচ্চুন্নী অনেক রকম ব্যবসার চেষ্টা করেছিল। এখন নারকেল দড়ির ব্যবসা করে। রোজ সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরে আসে।

কোচ্চুন্নী কাজে চলে গেলে পর বাসনপত্র সব ধুয়ে উপুড় করে ওর ছোট্ট মেয়ে খাদিজাকে নিয়ে পাতুম্মা সোজা আমাদের বাড়ী চলে আসে। ওর আসার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। ওর হাঁটা দেখে মনে হয় ও যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে। পেছনে লেজের মতো ছোট্ট খাদিজা। বাড়ীতে পৌঁছেই অবশ্য ও স্বপ্নরাজ্য থেকে মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসে। তখন ওর গলার আওয়াজে সারা বাড়ী গম্‌গম্ করে। ওর অবশ্য চেঁচিয়ে কথা বলার অধিকার আছে কারণ ও আম্মার বড় মেয়ে।

রোজকার মত সেদিনও পাতুম্মা বাড়ীতে ঢোকার পর আমি বেশ ভালো করে সব লক্ষ্য করতে লাগলাম। পাতুম্মা, ওর ছাগল, আম্মা, ওর ছোট বোন, ভাবী, ছোট ভাইয়ের বউ সকলেই বাড়ীতে রয়েছে। দেখা যাক্ কেমন ঠোকাঠুকি লাগে।

পাতুম্মা বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই ওর আম্মা, ছোট বোন আর ভাবীর দিকে তাকিয়ে বেশ একটু জোর গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমার ছাগলটাকে তোমরা একটু ফেনটেন দিয়েছ তো? আম্মা বলল, হ্যাঁ তোমার ছাগলকে আমি ফেন খাওয়াতে যাচ্ছি! আমার বলে হাজারটা কাজ।

পাতুম্মা তখন ভাইয়ের বউদের কি যেন জিজ্ঞেস করলো। তারপর ছোট বোনটাকে একটু শাসালো, আমি তোকে খুব ভালো করেই চিনি।

তার উত্তরে আনুম্মা কি বলল শুনতে পেলাম না তবে পাতুম্মা আম্মার কাছে ওর সংসারের দুঃখকষ্টের গল্প করছে তা শুনতে পেলাম। তারপর খানিকক্ষণ বাদে একটু উঁচু গলায় বলল, আমার জন্য তোমাদের কাউকেই কিছু করতে হবে না। আমার ছাগলটা বাচ্চা বিয়োক তখন আমি সকলকে দেখবো।

পাতুম্মার ছাগলের বাচ্চা হলে পাতুম্মা সকলকে কি দেখাবে কে জানে?

জামরুল গাছটা ফলে ভর্তি হয়ে যেন মৃদু মৃদু হাসছিলো। আমি সেদিকে তাকাতে তাকাতে আরাম কেদারাটায় শুয়ে পড়তেই 'ম্যাঁও ম্যাঁও' শব্দে দুটো তিনটে বেড়াল

ভয় পেয়ে ছুটে আমার কাছে এসে হাজির হলো। তাদের মধ্যে একটা লাফ দিয়ে আমার কোলে বসলো।

কি নোংরা বেড়ালটা?

কার কোলে এসে বসেছে ও? আমাদের দুজনের মধ্যে এতটুকু চেনা নেই। হয়তো আমাকে ওর খুব পছন্দ হয়ে গেছে। বসুক। বেড়াল কোলে বসে আছি তখন দেখি রাস্তা দিয়ে একদল মেয়ে যাচ্ছে। মেয়েগুলো সব হাইস্কুলে পড়ে—সকলের দৃষ্টি আমার দিকে।

কি ব্যাপার?

পাতুম্মার ছাগলের গায়ে একটা কাক এসে বসেছে। কাকটাকে বহন করে ছাগলটা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে আমায় যেন চিনতে পারছো না'—এই ভাবে কাকটা আমার দিকে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলো।

আমার সামনের বারান্দা থেকে মুরগীগুলো কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। কাকটা উড়ে গিয়ে তাদের দলে ভিড়লো।

'এই হতচ্ছাড়ীটা মরতে আবার এখানে এল কি করতে'? এই ভাবে মুরগীগুলো কাকটার দিকে চেয়ে দেখলো। 'আমারও এই বাড়ীতে খানিকটা অধিকার আছে' এই ভাবে কাকটা কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে বারান্দা থেকে খুঁটে খুঁটে কি সব খেতে লাগলো।

এই সভায় ইতিমধ্যে একটা সাদা বেড়াল এসে দাঁড়িয়েছে। মুরগীদের মধ্যে বড় কালো মুরগীটার এটা পছন্দ হলো না। মুরগীটা বেড়ালটার মাথায় দিল এক ঠোক্কর। লেজটা ফুলিয়ে গায়ের লোম খাড়া করে বেড়ালটা একবার ফোঁস করে উঠলো। 'আমারও এই বাড়ীতে অধিকার আছে কি না আছে তা আমি তোকে দেখাচ্ছি। সাহস থাকে তো দে দেখি ঠোক্কর আর একবার—'এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

এই সভায় এসে দাঁড়ালো আমার সবচেয়ে ছোট ভাই আবু বকর। আবু বকর সব সময় খুব পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। তেল চকচকে চুল বেশ কায়দা করে আঁচড়ে, ঝকঝকে জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে ও এসে দাঁড়ালো। ওকে আমরা সকলে আবু বলে ডাকি। ভদ্রলোক নাকি বামপন্থী—দিনে দু-বার করে পোষাক বদল করেন। আম্মা বলছিল ওর নাকি চৌষট্টি জোড়া জুতো আছে। ও একেবারে রোগা ডিগডিগে কিন্তু এত চেঁচাতে পারে যে তা আর বলার নয়। আর সব তাতে গোল পাকাতে ওস্তাদ। আমি আসার পর ওকে ওর ঘর থেকে আমি তাড়িয়েছি। আমার ঘরটায় আমার অনুপস্থিতিতে ও নবাবের মতো আরাম করে বাস করছিল। আমার আর আমার পরের ভাই আবদুল কাদেরের পড়ার জন্যে আব্বা ঐ ঘরটা আলাদা করে তৈরী করেছিলেন। সে সময়েই ও ঘর থেকে আমি আবদুল কাদেরকে হটিয়ে দিয়েছিলাম। আবদুল কাদের আম্মার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আবদুল কাদেরের চুল সব পেকে গেছে। ওকে দেখলে আমার বড় ভাই বলে মনে হয়। ও এখন আর একটা ঘর

বাড়ীর ও দিকটায় বানিয়েছে। ওখানে এখন হানিফা তার বউ আর ছেলেমেয়েরা রাত কাটায়। আবুকে, আমি এ ঘর থেকে হটিয়ে দেওয়ার পর ও ওর স্যুটকেশ, বই, বিছানা, লণ্ঠন সব নিয়ে হানিফার ঘরে উঠেছিল।

আবু এসেই চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল। আবুর চেঁচানি শুনে বেড়ালগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। কাকগুলো উড়ে গেল। মুরগীগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল। পাতুম্মার ছাগল মেয়েদের ওদিকে ছুটে পালাল। বাচ্চাদের কান্না, চেঁচামেচি সব বন্ধ হয়ে গেল। চিলগুলোও যেন নিঃশব্দে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। মেয়েদের কথাবার্তা বন্ধ হলো, বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আবু চীৎকার করছে,—ভাইসাহেব তুমি কিছু না বলে বলে আহ্লাদ দিয়ে এদের মাথায় উঠিয়েছ সব। বেড়াল, মুরগী, ছাগল, কাক, চিল এটা ভদ্রলোকের বাড়ী না কি? ছাগলকে খাওয়া দেবার জায়গা দেখনা। দেখাচ্ছি সব মজা। আম্মা ঐ লাঠিটা আর গুলতিটা একবার নিয়ে এসো তো।

পাতুম্মা খুব ভয়ে ভয়ে বলছে শুনতে পেলাম,—খাদিজা আমাদের ছাগলটাকে নিয়ে আয়। আমাদের তো আর এখানে কোন হক্ নেই। আম্মা—আমরা যাচ্ছি।

আবু আবার চীৎকার করল, আমারও এ বাড়ীতে কোন হক্ আছে কিনা দেখি। আজই আমি হানিফা ভাইসাহেব, ভাবী আর ছেলেমেয়েদের ওঘর থেকে তাড়াবো।

আমিও খুব চেঁচিয়ে বললাম, এই আবু অত গলাবাজী করিসনি। আর বেশী ইয়ার্কি মারলে আমি তোর জিনিষপত্র সব ভেঙে তছনছ করে দেব। ঐ তো পেন্সিলের মত চেহারা তার আবার তড়পানি দেখনা। হানিফাদের ও ঘর থেকে সরিয়ে দিলে ওরা যাবে কোথায়?

আবু আস্তে আস্তে বলল, হানিফা ভাইসাহেব ওর এস্টেটে একটা বাড়ী তৈরী করুক।

হ্যাঁ, এরকম একটা কথা আমি এসে অবধি শুনছি। বাড়ী তোলবার কথা হানিফা আমায় বলেছে বটে। মাইল দুয়েক দূরে রাস্তার কাছে একটা ঢিপির ঢালুর ওপর প্রায় আড়াই বিঘে জমি ও কিনেছে। এখন সেখানে কলা আর আমগাছ পুঁতেছে। ওখানে একটা বাড়ী করবার ইচ্ছে ওর আছে। তার জন্যে যা টাকা-পয়সার দরকার তা সব ও আমার কাছ থেকে আশা করছে। ওর কাছে পয়সা নেই আমাকে বলেছে। রোজ ভোর চারটের সময় উঠে ও ওর জমির কলা আর আমগাছগুলোয় জল ঢেলে সাতটার সময় বাড়ী ফেরে। তারপর আবী আর লায়লাকে নিয়ে নদীতে গোসল করতে যায়। আব্বা আর ছেলেমেয়েদের খুব ভাব। ওদের বাড়ী হলে পর আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, আবী আর লায়লা দুজনেই আমাকে বলেছে। সেয়দু মহম্মদও বলেছে যে ওদের নতুন বাড়ী হলে পর আমাকে নিয়ে যাবে। ও আর ওর আম্মা আনুম্মার জন্যে ওর আব্বা শিগগিরই আমাদের বাড়ীটার খুব কাছেই আর একটা বাড়ী করবে। বাড়ীর

কাঠের কাজ সব হয়ে গেছে। ইঁট, পাথর, চুন, সুরকিও সব আনা হয়ে গেছে। হানিফা কিন্তু এসব কিছুই জোগাড় করেনি। আমি বললাম, আবু হানিফার হাতে তো পয়সা নেই।

—তুমি জানানো—হানিফা ভাইসাহেব হাড় কিপটে। ওর হাতে অনেক টাকা।

—বাজে বকিস নি।

আবু তখন গুলতি আর কতকগুলো ঢিল নিয়ে পাখীগুলোকে তাক্ করতে লাগলো।

—আয়রে ছাগল আয়, ও কিছু করবে না—বলে ছাগলকে সান্ত্বনা দিয়ে ছাগল শুদ্ধ পাতুম্মা আমার কাছে এল। কাছেই উঠোনে আবু গুলতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে পাতুম্মা বলল,—এই আবু একটু বুঝেসুঝে চলিস। বড় ভাইসাহেব এসেছে তা দেখতে পাচ্ছিস না বুঝি?

—ভাইসাহেব, আপা আমাকে কি রকম 'তুই তোকারি' করছে শুনতে পাচ্ছ? ওঃ ভাইসাহেব এসেছে বলে তোমার খুব তেজ দেখছি যে—হুঁঃ।

আবুর বড়র বড়র বড় পাতুম্মা—ওকে আবু 'তুই তোকারি' করেছে খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি বললাম, তোকে কি তাহলে 'জনাব আবু' বলে ডাকতে হবে নাকি—অ্যাঁ? যা ভাগ্ এখান থেকে।

পাতুম্মা আমার আর একটু কাছে এল। চারপাশ দেখলো। কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে খুব আস্তে আস্তে বলল, ভাইসাহেব কেউ যেন জানতে না পারে। আনুম্মা জানতে পারলে গণ্ডগোল শুরু করবে। তুমি এবার থেকে আর টাকা পাঠিও না। খাদিজার জন্যে দুটো দুল গড়িয়ে দিও। হানিফাও যেন জানতে না পারে। আমার কর্তাও না, আম্মা, আবু কেউই যেন জানতে না পারে। আমিও খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, দুল সোনার চাই, না রূপোর? পাতুম্মা আবার চারপাশ দেখে বলল, সোনার। ভাইসাহেব, তুমি কাউকে বলবে না তো?

—কাউকে বলবো না।

তারপর পাতুম্মা বলল, দুল কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি চাই।

—দেখি।

দুলের ব্যাপারটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার একটা অবশ্য কারণ আছে। আমি বাড়ী আসার পর এর্ণাকুলম থেকে তিনটে ছোট ছাতা আনিয়ে একটা আবদুল কাদেরের মেয়ে পাতুকুট্টি, একটা হানিফার ছেলে আবী আর একটা আনুম্মার ছেলে সেয়দু মহম্মদকে দিয়েছিলাম। পাতুম্মার মেয়ে খাদিজাকে দিইনি। আবী, পাতুকুট্টি, সেয়দু মহম্মদ, খাদিজা সব প্রায় এক—বয়সী। দুষ্টুমিতে সকলে এক, কান্নাতেও সব সমান অথচ খাদিজাকে ছাতা দিইনি। না দেওয়ার কারণটা আর কিছু নয় ৺..মি ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে ওকে সোনার দুলই কিনে দেব।

পাতুম্মা চলে গেলে পর খুব আস্তে আস্তে আমার ছোট বোন আনুম্মা আমার

কাছে এল। ও গর্ভবতী। পাতুম্মা স্কুলে পড়েনি। আনুম্মা পড়েছে তাই ওর কথাবার্তা একটু মার্জিত। ও খুব আস্তে বলল, ভাইসাহেব তোমার আর আমাকে পয়সাকড়ি কিছু দিতে হবে না কিছু বাসনপত্র কিনে দিলেই হবে। তবে এখন চাই না। আমরা বাড়ী করে উঠে যাবার পর। তুমি আবার কাউকে যেন একথা বলতে যেও না।

অর্থাৎ পাতুম্মা যেন জানতে না পারে। জানলে বলবে—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঢের হয়েছে। তোর চালাকি আমি সব জানি। ওঃ উনি লেখাপড়া শিখেছেন। আমি যখন ছিলাম না তুই ভাইসাহেবের কাছ থেকে সব কিছু চেয়ে নিসনি?

তাই এত গোপনতা। বাসনপত্রের কথা কান থেকে কানে গেলেই মুশকিল। আনুম্মাকে সংসারের দরকারী বাসনপত্র কিনে দেব আর, কেউ এ কথা জানতে পারবেনা বলে ওকে আমি কথা দিলাম। কিছুক্ষণ সব কিছু শান্ত। হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনতে পেলাম।

—কাঠকুড়ুনী, ঘুঁটেকুড়ুনী তোকে আমি নিয়ে যাব না। লায়লার চীৎকার। কাকে ও 'কাঠকুড়ুনী' বলে গালাগালি দিচ্ছে? বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অপমানে লাল হয়ে কান্না ঘোলাটে চোখ নিয়ে সেয়দু মহম্মদ আমার সামনে এল। ও সম্পূর্ণ নগ্ন।

আমাকে তার অভিযোগ জানালো, বড় মামা লায়লা আমাকে 'কাঠকুড়ুনী' বলেছে। একটা ছেলেকে বলেছে 'কাঠকুড়ুনী' তাও আবার একটা মেয়ে। কি সাংঘাতিক!

—সেয়দু যা, শিগগির একটা লাঠি নিয়ে আয়।

সেয়দু মহম্মদ লাঠির খোঁজে গেল।

আমি ডাকলাম, লায়লা। এদিকে আয়।

ও এলো। লায়লাও সম্পূর্ণ নগ্ন। সেয়দু মহম্মদকে লাঠি আনতে দেখে বলল, বড় চাচাকে নিয়ে যাব না।

—যাসনা—বলে আমি সেয়দু মহম্মদের হাত থেকে লাঠিটা নিলাম। লায়লা ততক্ষণে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে।

—আম্মা, আম্মা।

আমি বললাম—তুই তোর আম্মাকে ডাক্, আব্বাকে ডাক, তোর নানাকে ডাক্। আমি সক্কলকে মারবো।

নানা হচ্ছে লায়লার আম্মার আব্বা। তিনি হানিফার কলাবাগানের কাছাকাছি কোথায় যেন কিছু জায়গা কিনেছেন। ওদিকে কোথায় যেন রেলষ্টেশন হবে তখন জায়গার দামও অনেক বেড়ে যাবে। জায়গাটার অনেক উন্নতিও হবে। এ সব ভেবেচিন্তে লায়লার নানা হানিফাকে দিয়ে এ জায়গাটা কিনিয়েছে।

লায়লা বলল, আম্মাকে মেরো না, আব্বাকে মেরো না, নানাকেও মেরো না।

—তাহলে সেয়দু মহম্মদকে তুই আর 'কাঠকুড়ুনী' বলবি?

—না, বলবো না।

তোর আব্বা বাড়ী করলে সেখানে সেয়দু মহম্মদ আর বড় চাচাকে নিয়ে যাবি?

ও কাঁদতে কাঁদতে বলল—সকলকে নিয়ে যাব।

যাক্ এ কেস্ এমনিভাবে এখানে শেষ হলো। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি সেয়দু মহম্মদকে দুটো লজেন্স আর একটা কলা দিলাম। আমার কাছে কলা, আনারস, চকোলেট, টোম্যাটো, চীনেবাদাম সব কিছুর স্টক আছে। লজেন্স শুধু আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি এসব বাচ্চাগুলোর কান্না থামানোর জন্যে। বাকী সব আমার ছোট ভাইয়েরা, পাতুম্মার বর কোচ্চুন্নী আর আনুম্মার বর সুলেমান আমাকে কিনে দিয়েছে। আমার স্বাস্থ্যটা ভালো না, ডাক্তার প্রচুর ফল খেতে বলেছে। তাই আমি এসব টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছি। বাক্সের ওপর উঠে একদিন সেয়দু মহম্মদ চুরি করে লজেন্স খাচ্ছিল আমি তা দেখতে পেয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে ধরা পড়ে যাওয়াতে বেচারা খুব লজ্জা পেয়েছিল। ও কেঁদেও ফেলেছিল। ওকে যাতে আর ভবিষ্যতে কাঁদতে না হয় তাই আমি লজেন্সগুলি বাক্সের মধ্যে পুরে রেখেছিলাম। সেয়দু মহম্মদকে কলা আর লজেন্স খেতে দেখে লায়লার কান্না এসে গেল। ওকেও আমি দুটো লজেন্স আর একটা কলা দিলাম। গন্ধ পেয়ে আরিফা ওখানে আসাতে তাকেও দিলাম। দুটো দুটো লজেন্স রশীদ আর সুবেদাকেও দিলাম। তারপর আনুম্মাকে এক কাপ চা আনতে বলে নিশ্চিন্ত মনে একটা বিড়ি ধরিয়ে আরামকেদারায় গড়িয়ে পড়লাম।

এইরকম ভাবে কিছুক্ষণ শুয়ে আছি দেখি আম্মা আসছে। আম্মার বয়স সাতষট্টি বা সাতাত্তর হবে। দাঁত একটাও পড়েনি। রোজ সকাল চারটেয় আম্মা ওঠে। তারপর জলে ভিজিয়ে রাখা নারকেল পাতাগুলো এনে বুনতে শুরু করে তারপর সেগুলো সব উঠোনে বিছোয়। রোদ লেগে সব শুখোক। সংসারের যাবতীয় জল কুয়ো থেকে তুলবে। দুহাতে দুটো ঘড়া বয়ে নিয়ে আসবে। পাতুম্মা, আনুম্মা, ঐশম্মা, কুঞ্জানুম্মা সকলকে বকাঝকা করবে, চেঁচামেচি করবে, রাত দশটা অবধি সংসারের কাজ করবে। পাতুম্মা সব সময়ে আমাদের বাড়ীতে থাকে না। বাড়ীতে আরও তিনটে মেয়ে রয়েছে তাদের দিয়ে কাজ করালেই তো হয়। আম্মার এত কাজ করার দরকারাই বা কি? চুপচাপ বসে থাকলেই তো হয়। যদি একথা আম্মাকে বলি তো বলবে—ওরা কিছু জানেনা। ঘরের কাজ এখনও সব ভালো করে শেখেনি। ওদের ঘাড়ে সব ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় নাকি?

আমি বলি—ঠিক আছে। ওরা সব কাজকর্ম শিখুক। তুমি ওদের হাতে সব ছেড়ে দাও।

তখন আম্মা বলবে—সংসারের কাজকম্মের তুই কি বুঝিস বাপু। তোর তো আছে একটা দেহ আর ঐ পেটটা।

আমি এতেও হার না মানলে বলে—ওদের সব বাচ্চা ছেলেমেয়ে নেই? ওদের দেখবে কে?

আমি বলি—একজন ছেলেমেয়েদের দেখবে, বাকী দুজনে কাজ করবে।

—তোর তো বললেই হলো। ওদের দ্বারা কাজকম্মো ভালভাবে হয় না বাপু। শোন, তুই আমাকে এখন কিছু টাকা দে তো।

আমাদের সব কথাবার্তা এসে থামে এই টাকায়।

টাকাপয়সার কথা আবার আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। তাই আম্মা অনেক ঘুরিয়েফিরিয়ে কথা বললেও আম্মার উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে আমার দেরী হয় না। কি দরকার আমার আম্মাকে দিয়ে সোজাসুজি টাকার কথা বলানো।

—খোকা তোর কাছে টাকা থাকলে গোটা দশেক দে তো দেখি।

আম্মার সঙ্গে এতক্ষণ যে বকলাম তা কোন কাজেই লাগল না।

—শোন্ আবদুল কাদের যেন জানতে না পারে। হানিফা, আনুম্মা, পাতুম্মা কেউই যেন জানতে না পারে।

আমি খুব চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম—কুঞ্জানুম্মা আর ঐশম্মা জানলে কোনো আপত্তি আছে?

আম্মা রেগে গেল। হয়েছে হয়েছে, দিবি তো দে। কেউ যেন জানতে না পারে। আমিও একটু রেগে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমি আসার পর থেকে তোমাদের এ সংসারে কত টাকা দিয়েছি—অ্যাঁ? খোলাখুলি আর চুপিচুপি তোমরা আমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছ শুনি?

আম্মা বলল, তুই কিছু দিস নি তা তো বলি নি। এখন শুধু দশটা টাকা দিলেই হবে।

—আমি যে এত টাকা দিলাম সেসব গেল কোথায়। টাকা দিয়েছি বেশি দিন তো হয় নি। কোথায় সেসব টাকা?

আম্মা খুব আস্তে আস্তে বলল, আস্তে আস্তে। সেসব আবদুল কাদের নিয়ে নিয়েছে।

—আমি তো ওকে আলাদা টাকা দিয়েছি। আসুক ল্যাংড়া একবার এদিকে।

ছোটবেলায় আবদুল কাদেরের গলা থেকে নীচ অবধি পক্ষাঘাত হয়েছিল। আব্বা হাজার হাজার টাকা খরচ করে ওর চিকিৎসা করিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সব ভালো হয়ে গিয়েছিল শুধু ডান পাটা ছাড়া। ডান পাটা ওর সরু, শুকনো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। এমনি আবদুল কাদেরের চেহারা যেন কুস্তিগিরের মতো। ক্রাচে করে চলাফেরা করে।

আম্মা আস্তে আস্তে বলল, ওকে কিছু বলিস নি। এই এত বড়ো একটা সংসারের ভার ওর ওপরে। ও না থাকলে দেখতিস এ সংসারটার কি হাল হত। তোর তো

আছে এই একটা দেহ আর একটা পেট। আর তা ছাড়া তুই নিজে কত পয়সা নষ্ট করেছিস তার কোনো হিসেব আছে? যখন যেখানে খুশি থেকেছিস, যা ইচ্ছে করেছিস।

—তার শাস্তি আমি পেয়েছি। তবে টাকা কি আমি এখানেও খরচ করি নি? তোমার এই সংসারের পেছনে আমি অনেক টাকা ঢেলেছি।

—আস্তে, আস্তে। তুই টাকা খরচ করিস নি তা কি আমি বলছি নাকি? এখন তুই আমাকে দশটা টাকা দে। কেউ যেন জানতে না পারে।

—এর আগেও সকলের অজান্তে তোমাকে আমি যে টাকা দিয়েছি তা আবদুল কাদের চেয়ে নিল কী করে? আমি যে তোমাকে টাকা দিয়েছি ও জানতে পারল কী করে?

—আস্তে, আস্তে। আবী আর পাতুকুট্টি বলে দিয়েছে। আমিও খুব আস্তে আস্তে বললাম, শোনো তোমাকে আমি একটা গোপন কথা বলি। কাউকে বোলো না। আমার কাছে এখন সবসুদ্ধ পাঁচটা টাকার একটা নোট আছে আর একটা আধলাও নেই।

আম্মা সঙ্গে সঙ্গে বলল,—তাইই দে এখন।

আমি আশেপাশে দেখে ঘরের ভেতর থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট আর একটা পাকা কলা নিয়ে এলাম। কলার গন্ধ পেয়ে পাতুম্মার ছাগল সামনে হাজির হল। কলার খোসাটা ওকে দিলাম। কী খাচ্ছি দেখতে পেয়ে আম্মার আশ্রিত বেড়ালগুলো এল, আম্মার মুরগীগুলোও। কলার খোসা খেয়েও পাতুম্মার ছাগলের সেখান থেকে নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। কিসের প্রতীক্ষায় ও যেন দাঁড়িয়ে রইল। আমি আবার চারিদিক দেখলাম। কেউ নেই, শুধু মুরগী, বেড়ালগুলো আর পাতুম্মার ছাগল। আমি খুব লুকিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা আম্মার হাতে দিলাম। আম্মাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নোটটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর আরম্ভ করল, দেখ্ আমার এই এতখানি বয়েস হয়েছে। ফট্ করে কবে ইন্তেকাল করব জানি না। আমার বড়ো সাধ যে তোর বউ নিয়ে ঘর করি।

আমি চেঁচামেচি শুরু করলাম, উঃ আমাকে তোমরা একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না। পাতুম্মা, আনুম্মা শীগগির আয়। আমার বাক্স বিছানা গুছো। একটা কুলী ডাক্।

ওরা দুজনেই ছুটে এল।

—কি হয়েছে আম্মা? আনুম্মা জিজ্ঞেস করল।

—ভাইসাহেবের কাছে আম্মা টাকা চেয়েছে বোধহয়—পাতুম্মা বলল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—না না, ওসব কিছু না।

আম্মা উঠে ওদিকে চলে গেল।

—কি হয়েছে আম্মা—বলতে বলতে আনুম্মা আর পাতুম্মাও আম্মার পেছন পেছন চলল।

আম্মা চলে যেতে আমি আনুম্মাকে দিয়ে এক কাপ চা আনিয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটা বিড়ি ধরালাম।

তখন দেখি পাতুম্মার ছাগল উঠোনে দাঁড়িয়ে বারান্দায় রাখা আমার দেশলাইটা মুখে পোরার চেষ্টা করছে। আমি দেশলাই বাক্সটা দিলাম।

পাতুম্মার ছাগল খুব খুশি হয়ে দেশলাই বাক্সটা খেল। তারপরও ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম—হে অজসুন্দরী! দেশলাইয়ের কাঠিগুলি আমার চাই। খালি দেশলাইয়ের বাক্স আরো অনেক আছে তোমাকে দেব।

এই সময় পাতুম্মা খানিকটা চালধোওয়া পানি এনে ছাগলটাকে দিল। আমি পাতুম্মাকে বললাম, পাতুম্মা, তোর ছাগল আমার দু দুটো বই খেয়েছে।

আমি যে একটা মহাপাতকের কথা বলেছি এমনি ভাবে পাতুম্মা বলল, অমন ভাবে বোলো না ভাইসাহেব। আমার ছাগল বইটই খায় না—তারপর খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

—দুলের কথা মনে আছে তো?

—মনে আছে।

—কেউ যেন জানতে না পারে—বলে পাতুম্মা খালি বাসনটা হাতে নিয়ে ওদিকে চলে গেল।

রশীদ আর সুবেদা আবার কাঁদছে। যেন ওদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাবার জন্যে আরিফা, সেয়দু মহম্মদ আর লায়লাও কান্না জুড়ে দিয়েছে। থেকে থেকে লায়লা 'তোকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব না' বলে প্রস্তাব করছে। এমন সময় আবু আমার একটা চিঠি নিয়ে এল। চিঠিটা আমার হাতেই দিল। বাচ্চাগুলোকে এক দাবড়ানি দিয়ে ওদিকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের কান্না থেমে গেল। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ।

চিঠিটা পড়লাম। দূর মাদ্রাজ থেকে চিঠি এসেছে। শ্রী এম. গোবিন্দনের স্ত্রী ডাক্তার পদ্মাবতী একটি শিশুসন্তান প্রসব করেছেন। আম্মা ও বাচ্চা ভালোই আছে।

আম্মা আর ছেলের মঙ্গল কামনা করে আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখলাম। গোবিন্দনের মেয়ে বালার একটা ছোটো ভাই হওয়াতে তাকেও অভিনন্দন জানালাম। বালার নিজের যে আড়াইটে টাকা আছে তা ব্যাঙ্কে রাখার জন্য ওর আব্বাকে উপদেশ দিলাম। শ্রী গোবিন্দন দ্বিতীয়বার পিতা হওয়াতে তাঁকেও অভিনন্দন জানালাম। সঙ্গে এ. নারায়নন্ নাম্বিয়ার এম. এ., কে. সি. এস. পানিক্কর, ডেভিড জর্জ, জানাম্মা, পারকুট্টি আম্মা, কে. এ. কোড়ুঙ্গালুর, গোপকুমার, শরৎকুমার, রামজী, আর. এম. মানিক্কৎ প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আমি দেশের বাড়িতে আছি, সকলের খবর

জিজ্ঞেস করেছি বলতে অনুরোধ করে চিঠিটা একটা খামে ভর্তি করে ঠিকানা লিখে আবুকে ডাকলাম।

—শীগগীর চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়ে আয়। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। আমি বললাম—দাঁড়া, দাঁড়া। তোর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ এসেছে। তুই আবদুল কাদেরের দোকানের টাকা নিয়ে যাকে পাচ্ছিস তাকেই নাকি ধার দিচ্ছিস। যত রকম মাসিক পত্রিকা আছে তার সবকটারই নাকি তুই এজেন্সি নিয়েছিস। তুই নাকি কারো একটা কথাও শুনিস না। এসব অভিযোগ কি ঠিক?

এত সব অভিযোগের উত্তরে ও বলল—কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

আমি এর উত্তরে কিছু বলার আগেই ও বলল—তুমি এসেছ দেখে আম্মা, আপা, ভাবী সকলে মিলে উঠোন বাড়িঘর সব ঝাঁটপাট দিয়ে নোংরা সব একসঙ্গে জড়ো করে পুড়িয়ে চারিধার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে। দেখেছ তুমি তো? আমি যখন সকলকে পরিষ্কার করতে বলেছিলাম তখন কেউ গায়েই মাখে নি। শুধু তাই নয় আমাকে ঝাঁট দিতে বলেছিল। এখন সকলে এরকম দেখাচ্ছে কেন? সব তোমার টাকাগুলো সাঁটবার মতলব। তোমার টাকা আছে তাই তোমায় খুশি করার জন্যে এরা সব এই রকম করছে, আমার কি টাকা আছে? আমি কি বড়োলোক? ভাইসাহেব, আমাদের এই উঠোনটা বেশ ভালো করে বাঁধাতে হবে, ওপরটা বদলে টালির ছাদ লাগাতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের মানে?

—মানে তুমি টাকা দেবে। আমার কাছে টাকা কোথায়?

ও চিঠিটা ফেলতে গেল। ও চলে গেলে পর আবদুল কাদের এল, আবদুল কাদেরের পর হানিফা।

হানিফা এককালে আর্মিতে ছিল। আর্মি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা দরজির দোকান দিয়েছিল, সঙ্গে একটা সাইকেলের দোকানও। হানিফা সবসময় বেশ পরিষ্কার, ফিটফাট। ডবল মুণ্ডু[১] আর জোব্বা পরে, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, চুল বেশ বাহার করে আঁচড়ে সব সময় ফিটফাট থাকে। এখন ওর পরিধানে শুধু একটা মুণ্ডু। যেন কী একটা গোপনীয় কথা ও বলতে চায়। আমি চুপ করে রইলাম। কী দরকার আমার আগে কথা বলার।

ও বলল, ভাইসাহেব, আমার জায়গাটা বিক্রি করে দেব ভাবছি। তুমি যদি কিনতে চাও তো একটু অল্প দামেই দেব।

—কেন, এখন জায়গা বিক্রি করার কি তাড়া পড়ল?

—পয়সা নেই। হাতে পয়সা থাকলে আমাকে এ বেশে দেখতে না। ভালো জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতাম।

---

১. আট হাত ধুতি। সাধারণতঃ মালয়ালীরা চার হাত ধুতি লুঙ্গীর মতো করে পরে।

—কত দাম তুই পাবি বলে মনে হয়?

—তোমাকে আমি কম দামেই দেব। দশ হাজার টাকা আমাকে দিয়ো।

দশ হাজার টাকা! হানিফা ঐ জায়গাটা কত টাকায় কিনেছে আমি জানি। আমি বিষয় বদলালাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখন বাড়িতে কত করে দিচ্ছিস?

দু তিন বছর আগে হানিফা বাড়িতে দিত দিনে দু আনা করে। ওর, ওর বউয়ের আর দুটো বাচ্চার খোরাকী। বিছানাপত্র ও কিছু কেনে নি। তেল সাবান সব ঐ দু আনার মধ্যে। আবদুল কাদের এর জন্যে ওকে অনেক খারাপ কথা শুনিয়েছে কিন্তু ও সেসব কিছু গায়ে মাখত না। বেশি কিছু বললে ভয় দেখাত যে ও আর্মিতে চলে যাবে। সরকারের ওকে দরকার আর কারুর দরকার থাক্ বা না থাক্।

যা হোক্ আমার মধ্যস্থতায় তখন একটা মিটমাট হয়েছিল। দু আনা থেকে আমি চার আনা করেছিলাম; ক্রমে তা বারো আনায় ওঠে। আমি বাড়ি থেকে চলে যাবার পর হানিফা তাকে আবার কমিয়ে এনেছিল। শেষে আবার সেই দু আনাতেই নামিয়েছিল। হানিফার এখন আর একটা বাচ্চা বেড়েছে। সংসারে সত্যিই ওর আরও কিছু পয়সা দেওয়া উচিত। কিন্তু ও আমার প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দিল না। বলল, ছোটো ভাইসাহেবের উৎপাতে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেলাম।

—আবদুল কাদের আবার তোকে কি বিরক্ত করছে?

—এই দেখ না সেদিন একগোছা নোট নিয়ে আমার দোকানে এল। সেখানে তখন অনেক ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেসব ভ্রূক্ষেপ না করে 'এই দেখ্' বলে এক গোছা নোট আমার মুখে ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, 'তোর টাকার আমি থোড়াই কেয়ার করি' বলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল। এতগুলো লোকের সামনে এমনিভাবে অপমান। আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। আমি তোমাকে রোজ বিড়ি কিনে দিই না? দেশলাই কিনে দিই না? আমার পয়সা নেওয়া হচ্ছে অথচ 'তোর টাকার থোড়াই কেয়ার করি' বলার মানেটা কি?

তা ঠিকই। তবে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বললাম না। আমি বললাম, তোর এখন একটা বাচ্চা বেড়েছে। রেশন কেনার জন্যে তুই কত টাকা এখন দিস?

বাস! সঙ্গে সঙ্গে ও বলল—আমি আর্মিতে চলে যাব। গভর্ণমেণ্টের আমাদের মতো লোকের দরকার।

ও রেগেমেগে ভেতরে গেল। খেয়েদেয়ে দরজির দোকানে গেল।

আমার ভাত খাওয়ার সময় পাতুম্মার ছাগলটা বারান্দায় উঠে এল। আমার সঙ্গে খাওয়ার মতলব।

আমি চীৎকার করলাম,—পাতুম্মা শীগগির আয়।

পাতুম্মা ছুটে এসে ছাগলটাকে উঠোনে নিয়ে গেল। আমি বললাম, ছাগলটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ।

পাতুম্মা বলল, দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতে ও একদম ভালোবাসে না ভাইসাহেব।

সন্ধেবেলায় পাতুম্মার বর কোচ্চুন্নী এল। কখনও কখনও কোচ্চুন্নী আমাদের বাড়িতেও রাত্র কাটায়। আমার কাছেই শোয়। আমার একদিকে আম্মা, কোচ্চুন্নীর ওদিকে আবু। হানিফা ওর বউয়ের সঙ্গে অন্য একটা ঘরে। আবদুল কাদের ওর পরিবারের সঙ্গে আর একটা ঘরে। বারান্দায় চটের আড়ালে আনুম্মার সংসার। কোচ্চুন্নী যেদিন নিজের বাড়িতে শোয় না সেদিন সারা পরিবারটা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আগে মশাল জ্বালিয়ে কোচ্চুন্নী, তার পেছনে পাতুম্মা, পাতুম্মার পেছনে লেজের মতো ওর মেয়ে খাদিজা আর খাদিজার পেছনে ছাগলটা।

দুই

পাতুম্মার ছাগলের উৎপাত সকালেই আরম্ভ হল। তখন বোধহয় সকাল আটটা। মাথায় আর সারা গায়ে বেশ ভালো করে তেল মেখে গোসল করার আগে একটু কসরত করছিলাম। হঠাৎ উঠোনে বাচ্চাদের একটা গোলমাল শুনতে পেলাম।

—কাঠকুড়ুনী, ঘুঁটেকুড়ুনী।

—লেজটা ধর, লেজটা ধর।

—পেচ্ছাপ করছে। দেখলি না পেচ্ছাপ করছে যে।

—শিং দুটো ধর, শিং দুটো।

কি ব্যাপার? আমি জানলা দিয়ে তাকালাম। বিশেষ কিছু ব্যাপার নয়। পাতুম্মার ছাগল আবী-র হাফপ্যান্টের সামনের দিকটা সবটা খেয়ে ফেলেছে। বাকীটা খাওয়ার আগে বাচ্চারা ছাগলটাকে চেপে ধরেছে। আবী ছাগলের ঘাড়টা ধরে আছে। পাতুকুট্টি লেজ ধরে টানছে। সেয়দু মহম্মদ শিং দুটো ধরেছে। আরিফা, রশীদ আর সুবেদা কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে হাঁ করে ওদের দেখছে। লায়লা ছাগলটার পেটটা ধরে তাকে গালাগালি দিচ্ছে।

—কাঠকুড়ুনী, ঘুঁটেকুড়ুনী।

আমি তোয়ালেটা জড়িয়ে নিয়ে বাইরে এলাম। ছাগলের ঘাড় থেকে আবীকে সরিয়ে দিয়ে ওর কান দুটো ধরলাম। হাফপ্যান্টের সামনের দিকটা শুধু না, একটা পকেটও ছাগলটা খেয়ে ফেলেছে।

সব ব্যাপারটা শুনে বুঝলাম পাতুম্মার ছাগলের কোনো দোষ নেই। আবী-র হাফপ্যান্টের পকেটের ভেতর ছিল তেলেভাজা পিঠে। খানিকটা ও ছাগলটাকে দিয়েছে। বাকীটা প্যান্টের পকেটে রেখে ছাগলটাকে দেখিয়ে খেতে বলেছে। ছাগলের আর দোষ কি! ছাগল পিঠে আর তার সঙ্গে প্যান্টের খানিকটা খেয়ে নিয়েছে।

আবী বলল, আব্বা মারবে।

আমি বললাম—তা বুঝি তোর আগে মনে ছিল না। মারুক তোকে।

বেচারী খুব ভয় পেয়ে গেছে দেখে বললাম, ঠিক আছে যা। তোর আব্বাকে কেউ বলে দেবে না।

আমি, লায়লা, পাতুকুট্টি, সেয়দু মহম্মদকে বারণ করে দিলাম ওরা যেন এ নিয়ে কাউকে কিছু না বলে। লায়লাকে এর ওপর এবার থেকে 'কাঠকুড়ুনী-ঘুঁটেকুড়ুনী' বলে কাউকে গালাগালি দিতেও বারণ করলাম।

নদীতে গোসল করতে গেলাম। সেয়দু মহম্মদ আর পাতুকুট্টিকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। তখন আবী আর লায়লাও এল। ওরা ওদের আব্বার সঙ্গে গোসল করতে যায় নি। আমার সঙ্গে যাবে বলে অপেক্ষা করছিল। একটা কারণ ছিল বৈকি। আবীর স্লেট পেন্সিল লায়লা টুকরো টুকরো করেছে তাই তার শাস্তি হিসেবে ওদের আব্বা ওদের দুজনকেই গোসল করতে নিয়ে যায় নি। পাতুকুট্টি আর আবীকে স্লেট পেন্সিল কেনার জন্য হানিফা আবার দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

আমি সবগুলো বাচ্চাকে নদীতে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে পাড়ে বসিয়ে দিলাম। তারপর ডুব দেবার জন্যে জলের ফেনা সরাচ্ছি এমন সময় আবীর ডাক্ শুনতে পেলাম, বড়ো চাচা।

আমি ফিরে তাকালাম। না, বাচ্চারা কেউ জলে পড়ে নি। আমি সাঁতার দিয়ে পাড়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে?

আবী বলল—আমার প্যাণ্ট নেই।

ওর লজ্জা ঢাকবার কিছু নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ও রাস্তা দিয়ে যাবে কি করে?

—তুই তো ল্যাংটো হয়েই এসেছিলি?

তা ঠিক। তবে এইমাত্র আবী ওর স্কুলে পড়া একটা ছেলেকে নৌকোয় দেখেছে, তার পরনে মুণ্ডু আর ও কি করে একেবারে ল্যাংটো হয়ে যায়? আবীর লজ্জা ঢাকবার জন্যে ওকে আমি একটা তোয়ালে দিলাম। তখন পাতুকুট্টিরও লজ্জা জাগল। ওরও কিছু পরার চাই।

আমি মাথা পুছে তোয়ালেটা কেচে পাতুকুট্টিকে দিলাম। লায়লা আর সেয়দু মহম্মদের তখনও লজ্জাবোধ জাগে নি। জাগলেও কোনো উপায় ছিল না। দুটো তোয়ালে আমি ইতিমধ্যে দুজনকে জড়াতে দিয়েছি।

বাড়ি ফিরে দেখি আবদুল কাদের আর হানিফার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া লেগে গেছে। ঝগড়া বাধার কারণ হচ্ছে যে কাল রেশন কেনার জন্যে হানিফা বাড়িতে একটাও পয়সা দেয় নি; আবদুল কাদের তা জানতে পেরেছিল। তাই নিয়ে ঝগড়া। হানিফা ওর পরিবার সুদ্ধু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখাচ্ছে।

হানিফা চেঁচালো।

—ঐশম্মা বেরিয়ে এসো, বাচ্চাদের ডাকো।

হানিফা ওর জমিতে কটা নারকেল পাতার ছাউনী দিয়ে কুড়ে ঘর তৈরি করে বাস করবে। আমি তাকিয়ে দেখি ও আমার মুণ্ডু পরেছে। চুরি করেছে নিশ্চয়ই। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতেই, 'আমার এখন কথা বলার সময় নেই, অনেক কাজ' বলে ওখান থেকে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আমার এ বাড়িতে কোনো হক্ নেই তা আমি দেখতে পাচ্ছি।

হানিফা ওর দোকানে গেল। আমি আবদুল কাদেরকে বললাম—আচ্ছা আমাকে তো তুই এই গণ্ডগোল থেকে অনায়াসেই রেহাই দিতে পারিস। ইন্সপেক্টর সাহেবকে আর একবার বলে দেখ না বাড়িটা খালি করে দেন কিনা।

আবদুল কাদের বলল—ভাইসাহেবের এখানে অসুবিধেটা কি হচ্ছে শুনি? তেল, ঘি, দুধ, চিনি, চা, বিড়ি, দেশলাই, চাঁপা কলা, মত্তমান কলা, টোম্যাটো, আনারস, কাঁঠাল, ভাত আর তার সঙ্গে আম্মা, আমি, আবু, কোচ্চুন্নী—আর তোমার চাই কি?

আবদুল কাদের আগে স্কুলের শিক্ষক ছিল। ব্যাকরণ জ্ঞানও ওর খুব টনটনে। অনেকদিন আগে ও একবার আম্মাকে বলেছিল, মাতা, আমাকে একটু শুদ্ধ পানি দাও।

সেদিন আম্মা ওকে হাতার বাড়ি মেরেছিল। আব্বা ওকে সাহস দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার থেকে ঐ বলেই ডাকিস। তা আমাকে কী বলবি? পিতা।

তা শুনে আম্মা আর একবার হাতার বাড়ি মেরেছিল। তারপর থেকে অবশ্য আর কোনোদিন ও মাতা-পিতা বলে ডাকে নি। আমাকে আর ওকে একসঙ্গে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। সেটা ছিল মুসলমানদের স্কুল। উম্বিয়ান্নন্ নামে এক ভক্ত ঐ স্কুলটা তৈরি করেছিল।

ক্লাস ওয়ানের শিক্ষক ছিলেন নারায়ণ পিল্লা। উনিই আমাকে আর আবদুল কাদেরকে অ, আ লিখতে শিখিয়েছিলেন।

আবদুল কাদের স্কুলেও বদমাইশি করত। আমি স্কুলে খুব সভ্য হয়ে থাকতাম। নারায়ণ স্যার আবদুল কাদেরকে খুব মারতেন, আবদুল কাদের তার বদলা নিতে স্কুলের ছেলেদের মারত। আমাকেও মেরেছে কত। ও ওর খোঁড়া পাটাকে বাঁ পায়ে ঘিরে ছেলেদের মারত। তারপর ওর ডান পায়ের তলা ওর নাক বরাবর এনে ছেলেদের জিজ্ঞেস করত—এই তোরা কেউ এমনি করতে পারিস?

কেউ পারে না। কি করে পারবে?

—তা হলে আমার পায়ের তলাটা শুঁকে দেখ।

ওর ল্যাংড়া পায়ের তলা সকলকে শুঁকে দেখতে হবে। না দেখলে সকলকে মারবে। যদি ছেলেরা দূরে সরে থাকে তা হলে ও ওর বুক চাপড়ে কাঁদতে আরম্ভ করবে। ওর একটা পা নেই বলে সকলেরই ওর ওপর একটা অনুকম্পার ভাব আর ও তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। ও যত দোষই করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

ছেলেদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর হাতে মার খেতে হবে। আমিও ওর হাতে অনেক মার খেয়েছি। তা ছাড়া ওর স্লেট, পেন্সিল বইও কত বয়েছি। আমি ওর বড়ো ভাই, আমার স্লেট পেন্সিল বই ওর বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত তা না আমিই ওর বই বয়েছি। যদি না নি, তো আমাকে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারত।

আমি ওর হাতে অনেক মার খেয়েছি। ওর অনেক বইপত্র বয়েছি। আমার মধ্যে এই অত্যাচারের প্রতিবাদের ঝড় উঠত কিন্তু কী যে আমি করব ভেবে পেতাম না। ও বই স্লেট পেন্সিল রাস্তায় রেখে ঘুঁষি পাকিয়ে আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করবে,—আমার স্লেট আর বই নিচ্ছ তো?

—না নেব না—প্রত্যেকদিন ওকে আমি বলি। বোঝাতে চেষ্টা করি—আমি তোর বড়ো ভাই না?

—নেবে কিনা বলো?

—নেবো না।

তখন ও একপায়ে দাঁড়িয়ে এক ঘুঁষি লাগায় আমার বুকে। আমি টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যাই। উঠতে কিছু সময় লাগে। ও আজ্ঞা করে, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, মাস্টারমশাই মারবে।

আমি মাটিতে পড়ে ব্যথায় ছটফট করতে করতে ভাবি—এ কোথাকার নিয়ম? ছোটো ভাই মারবে, বড়ো ভাই সে মার ঘাড় পেতে নেবে। শুধু তাই নয় বই স্লেটও বইতে হবে।

আমাকে ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে ও আমার বুকের ওপর চেপে বসে জিজ্ঞেস করবে, আরও দু-এক ঘা চাই নাকি?

আমি সত্যি কথাই বলি—না আর চাই না। আমি তোর বই স্লেট নিচ্ছি।

তারপর উঠে ওর বই স্লেট আর যা যা আছে সব আমি বয়ে নিয়ে যাই। উঃ এরকমভাবে কতদিন যে ওর হাতে মার খেয়েছি, কতদিন যে ওর বই স্লেট বয়েছি।

শেষকালে একদিন আমার বুদ্ধির উদয় হল। একদিন ঘুঁষি মারার জন্যে ও যখন আমার দিকে এগিয়ে আসছে তখন দিয়েছি আমি এক ঘা ওর ভালো পাটায়। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল কাদের পপাত ধরণীতল। আমি তক্ষুনি ওর বুকের ওপর চড়ে বসলাম। আমি যেন একটা মহা অপরাধ করেছি এমনিভাবে ও বলল—এ কি রকম তোমার ব্যবহার? আমি তোমার ছোটো ভাই না? তুমি বড়ো ভাই হয়ে আমার বুকের ওপর চেপে বসেছ?

আমি ওকে মারবার জন্য ঘুঁষি পাকালাম। ও কাঁদতে শুরু করল, আমায় মেরো না, আমি তোমার ছোটো ভাই।

ছোটো ভাই! হারামজাদা।

—এ কথা তোর এতদিন মনে পড়েনি কেন রে, হারামজাদা।

—এবার থেকে রোজ মনে রাখব।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম,—কুকুর দেখলে আগে ঢিল ছোঁড়ে কে?

—ভাইসাহেব, তুমি।

—নদীতে গোসল করার সময় ডুব দিয়ে অপর পাড়ে আগে কে পৌছোয়?

—তুমি।

—বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে তার ভাগ তোকে দেয় কে?

—তুমি।

—নারায়ণ স্যারের টেবিল থেকে চক চুরি করে তোকে তার ভাগ দেয় কে?

—তুমি, ভাইসাহেব।

—হুঁঃ—তারপর বল আর কি কি?

—আমি তোমার বই শ্লেট বয়ে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, তোরটা তুই নে।

এমনিভাবে সেদিন থেকে আবদুল কাদের সত্যিই আমার ছোটো ভাই হল। সেই আবদুল কাদের হচ্ছে এইই—এখন যে কথা বলছে। ল্যাংড়া।

আমি বললাম,—তুই তো অনায়াসেই ইন্সপেক্টর সাহেবকে উঠে যেতে বলতে পারিস। আমি আর এত হট্টগোলের মধ্যে থাকতে পারছি না।

—ভাইসাহেব, ইন্সপেক্টর বাড়ি খুঁজছেন। আর কিছুদিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

ক্রাচে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে ও চলে গেল।

আমি একটা আনারস কেটে তার খোসা ছাড়াচ্ছি তখন পাতুম্মার ছাগল আর বাচ্চারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কলা, আনারস যা যা আমার কাছে আছে তার এক এক টুকরো বাচ্চাদের দিতে ওরা কোনোরকম গোলমাল না করে চলে গেল। ওরা চলে গেলে পর আনুম্মার ছেলে সেয়দু মহম্মদ আমার কাছে যেন এমনিই এসেছে এমনভাবে আমার কাপড়টা ধরে ওর মুখটা দেখায়। ওকে আমার একটু বেশি করেই দিতে হয়। খোসা সব পাতুম্মার ছাগলকে দিলাম। হাত ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে চেয়ারে বসলাম। তখন স্কুলের মেয়েরা সব যেতে শুরু করেছে। রোজকার মতো তারা আমার দিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে।

মেয়েদের আমার দিকে ও ভাবে তাকানোর মধ্যে কী রহস্য লুকিয়েছিল তা অবশ্য আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। সে কথা পরে হবে।

সেদিন আবী আর পাতুকুট্টি রোজকার মতো স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আবী রাস্তা থেকে ইশারা করে আমায় ডাকছে।

কি ব্যাপার?

আমি গেলাম। পাতুকুট্টি একটা নারকেল গাছের তলায় চুপ করে বসে আছে। আমি কাছে গেলে আবী বলল—বড়ো চাচা, আব্বা শ্লেট পেন্সিল কেনার জন্যে দুটো

পয়সা দিয়েছিল।

—দুটো পয়সা?

—হ্যাঁ। হাফ প্যান্টের পকেটে ছিল।

—কী বলছিস, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—ছাগলটা যে পকেটটা খেয়েছে তাতে পয়সা দুটো ছিল। ওঃ হোঃ পাতুম্মার ছাগল পয়সা দুটোও খেয়ে ফেলেছে। আমি বললাম,—আচ্ছা এখন কাউকে এ কথা বলিস না। চুপচাপ থাক্। আমি দেখি দুটো পয়সা জোগাড় করতে পারি কিনা।

আবী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল,—নানী যেন জানতে না পারে। জানলে মারবে।

—তোরা লুকিয়ে থাক্ এখন।

আমি বাড়ি এসে পাতুম্মার কাছ থেকে দু আনা ধার করলাম। তার থেকে দুটো পয়সা আবী আর পাতুকুট্টিকে দিয়ে ওদের স্কুলে পাঠালাম।

পাতুম্মার ছাগলটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো সময় ওর নাদির সঙ্গে পয়সা দুটো পড়তে পারে। আমি অপেক্ষা করে রইলাম যদি পয়সা দুটো পড়ে। নাঃ ছোটো ছোটো নাদি পড়ছিল। গোল মতো কিছু পড়ল না।

পড়বে কি পড়বে না? আমার চোখদুটো ছাগলের পেছনে।

অমনিভাবে আমি যখন বসে আছি তখন একের পর এক মেয়েরা আমার দিকে কিরকম ভাবে তাকাতে তাকাতে স্কুলে যাচ্ছিল। আমার দিকে ওদের এ ভাবে তাকাতে দেখে আমি সত্যি* খুব খুশি হলাম। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে আমি কে। তাই ওভাবে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। ওরা নিজেদের মধ্যে এমনিভাবে কথাবার্তা বলছে আমি অনুমান করলাম। (এটা অবশ্য আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা)।

কুঞ্চিতকেশী—ঐ ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন যে ভদ্রলোকটি, তিনি কে জানিস?

হরিণনয়নী—জানি বৈকি। উনিই তো সেই সুপ্রসিদ্ধ লেখক বৈকম মুহম্মদ বশীর।

কোকিলকণ্ঠী—আমি আমার অটোগ্রাফে ওনাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেব।

বিড়ালাক্ষী—আরে দূর। এ ভদ্রলোক সেই ভদ্রলোক নন। বাড়িটা দেখ না কেমন কুড়েঘরের মতো।

মধুকণ্ঠী—যাঃ তুই কিছু জানিস না। উনিই সেই ভদ্রলোক। দেখবি আমার অটোগ্রাফে ওনাকে দিয়ে লেখাব?

বিড়ালাক্ষী—যা না। দেখি কেমন সেই লেখক কিনা।

সেদিন দুপুরের খাওয়ার পর স্কুলে যাওয়ার পথে মেয়েগুলো আমাদের বাড়িতে এল।

তখন আমার আর একটা ঘটনার কথা মনে হল।

আমি তখন ঐ আলাদা বাড়িটায় থাকতাম।

আমি এখানে আছি জানতে পেরে হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই এসে আমাকে

বললেন,—স্কুলের বার্ষিক উপলক্ষে আমি যদি কিছু একটু বলি তো বড়ো ভালো হয়। ছেলেমেয়েদের উপদেশের ছলে কিছু বলা—বলবেন কি?

—আমি বক্তৃতা করতে পারি না। আর তা ছাড়া সে সময় আমি এখানে থাকব না।

উনি বললেন—আমরা আপনার নাম নিমন্ত্রণপত্রে ছাপব, যদি থাকেন তো দয়া করে আসবেন।

নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হল। তাতে আমার নামও রয়েছে দেখলাম। কী যে করি! আমি এখানে এসেছি, নিশ্চিন্ত মনে কিছু লেখার জন্যে তাও দেখছি এরা করতে দেবে না।

একদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি দেখি গেটের ওদিকে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। কোঁকড়া চুলের একটা মেয়ে, আমি ভাবলাম মেয়েটা হয়তো যুঁই বা বেলফুল নিতে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কি চাও?

মেয়েটা বলল—আপনার নাম নিমন্ত্রণপত্রে ছাপা হয়েছে। আপনাকে আমাদের কিছু বলতে হবে। না আসলে কিন্তু হবে না।

—থাকলে আসব।

এর পরের কয়েক দিন রোজ ঐ মেয়েটার আর তার সঙ্গে আরও কতকগুলি মেয়ে গেটেই অপর পাশ থেকে আমাকে বলত,—আসতে হবে, না এলে কিন্তু হবে না। শুনছেন?

আমি বার্ষিকের আগের দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম, বাক্স বিছানা কিছু না নিয়ে একেবারে খালি হাতে। শুধু আম্মাকে বলে গিয়েছিলাম। ফিরলাম বার্ষিকের পরের দিন। সেদিনই কুঞ্চিতকেশী এবং আরও কয়েকজন এসে জিজ্ঞেস করল,—আপনি এরকম করলেন কেন?

আমি বললাম, থাকলে আসব বলেছিলাম।

—বেশ লোক আপনি। যাক এ ঘটনার যবনিকা এখানেই পড়ল।

গেট পেরিয়ে যে মেয়েগুলো এল তাদের মধ্যে কোঁকড়া চুলের সেই মেয়েটা আছে কিনা আমি দেখলাম। নেই—মেয়েগুলো সব খুব বড়ো হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এই মেয়েগুলো বড়ো হয়ে গেল?

আমি ওদের অটোগ্রাফে লিখব বলে কলমটা ঘর থেকে নিয়ে আসব ভাবলাম। ভাবলাম আসুকই না ওরা। এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্।

ওরা এল, আমার দিকে তাকিয়ে দেখলই না। সোজা জামরুল গাছটার কাছে গিয়ে আম্মাকে কী যেন বলে কী একটা দিল। আম্মা কাপড়ের আঁচল থেকে হাতভর্তি জামরুল নিয়ে ওদের দিল। ওরা জামরুল খেতে খেতে জামরুল গাছটার দিকে সতৃষ্ণ

দৃষ্টিতে দেখছিল। উঃ মেয়েগুলো কি গাধা! আম্মার ঐ নোংরা কাপড়ের আঁচল থেকে জামরুল নিয়ে খেতে ওদের এতটুকু বাধছে না অথচ আমি কত পরিষ্কার, ফিটফাট, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখছেও না।

হঠাৎ আমার বোধোদয় হল। ওঃ মেয়েগুলো তা হলে এতদিন আমাকে দেখছিল না। ওরা চলে গেলে পর আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে ওরা কী দিল গো?

—এক আনা।

—তুমি বুঝি ওদের কাছে জামরুল বিক্রি করলে?

—তা ছাড়া আবার কি?

—এক আনায় কতগুলো দিলে?

—কুড়িটা!

বাঃ বেশ মজা তো। অমনি কত কুড়ি আমি পাতুম্মার ছাগলকে খাইয়েছি।

মেয়েগুলো আমার দিকে তাকিয়ে না দেখাতে আমি সত্যিই খুব রেগে গিয়েছিলাম। আম্মাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই জামরুল গাছটা এখানে লাগিয়েছিল কে?

—জামরুলের বীচি তুই তালিয়াক্কলদের বাড়ি থেকে এনে পুঁতেছিলি।

তালিয়াক্কল হচ্ছে এক জেকোবাইট খৃস্টান পরিবার, কাছেই থাকে। ওখানে তোম্মন, মাতনকুঞ্জু, আর কুঞ্জাপ্পন নামে আমার বন্ধুরা আছে। আমি ওখান থেকে বীচি এনেছি আর সেই বীচি আজ এই মহীরুহে পরিণত হয়েছে শুধু আমারই একান্ত চেষ্টায় আর পরিশ্রমে। আর এই গাধাগুলো আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলই না। আমি হঠাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে আম্মাকে বললাম, দেখি ঐ আনাটা।

আম্মা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আনাটা দিল। আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। বিড়ি কিনে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। আমার দিকে না তাকিয়ে দেখা সেই গর্দভ মেয়েগুলোর কথা স্মরণ করে আমি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়লাম—ফুঃ।

মেয়েগুলো স্কুলে যাবার সময় আমার ঐ জামরুল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। গাছটায় ঘন হয়ে জামরুল ধরে রয়েছে। আমি নিজের মনেই বলি, গাধাগুলো দেখ, ভালো করেই দেখ। গাছটা আমার। এ গাছ পুঁতেছি আমি। বড়ো করেছি আমি—আর তোরা আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখছিস না।

মেয়েগুলোকে কি করে যে জব্দ করা যায়। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাবছি এমন সময় মেয়েগুলো এল। আমি উঠে খুব অবজ্ঞা ভরে জিজ্ঞেস করলাম,—কি চাই?

—দু পয়সার জামরুল।

—পয়সা দাও।

পয়সা নিয়ে ট্যাঁকে গুজলাম। তারপর খুব ছোটো ছোটো দেখে দশটা জামরুল দিলাম।

—একি এত ছোটো ছোটো কেন? ঐ নানী কত বড়ো বড়ো দেয়।

—গাছটা নানীর নয় তাই বড়ো বড়ো দেখে দিতে নানীর গায়ে লাগে না।

গাধাগুলো।

—তা হলে আর একটা বেশি দিন।

—এই গাছ পুঁতে তাকে অনেক কষ্টে বড়ো করেছে যে তার ইচ্ছে নয় যে আর একটাও বেশি দেয়।

আমি ওদের একটাও বেশি দিলাম না।

—উঃ কি লোক রে, বলে হ্যাংলা মেয়েগুলো চলে গেল। লোভীগুলো! আমার দিকে একটু তাকাতে পারো না না? কিন্তু আমার জামরুল গাছটার দিকে তাকাতে পারো তাও একেবারে নির্লজ্জভাবে।

এমনিভাবে জামরুল বিক্রি করে পয়সা উপায় করছি আম্মা এসে তার পয়সা চাইল।

—কেন, তোমাকে আমি পয়সা দেব কেন? এই গাছের ওপর তোমার কি কোনো অধিকার আছে? এ গাছ আমার কঠিন পরিশ্রমের ফল। আমার এক একটা ঘামের ফোঁটা এই এক একটা জামরুল। আম্মা, তুমি আজ কবছর হল এই জামরুল বিক্রি করছ? সে সব পয়সা কোথায়?

আম্মা কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখনও শেষ করি নি।

—এ ছাড়াও বাগানের সমস্ত ফলমূলের টাকা আমার পাওনা। আর হ্যাঁ এই তেঁতুল গাছটা পুঁতেছে কে? উঠোনের একপাশে বেশ বড়ো একটা তেঁতুল গাছ আছে। গাছটা তেঁতুলে ভর্তি হয়ে আছে। আম্মা তেঁতুলও বিক্রি করে। এই তেঁতুল গাছটাও কি আমি পুঁতেছিলাম?

আম্মা বলল, ও গাছটা তোর আব্বা পুঁতেছিলেন আর আমি তাতে অনেক পানি ঢেলেছি।

—হুঁঃ তা হলে ওর মালিক আমি নই।

আম্মা বেশ একটু রেগে চলে গেল। আমি আনুম্মাকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বললাম। আনুম্মা পাশের বাড়ির একটা ছেলেকে দিয়ে এক গেলাশ চা আনিয়ে দিল। আমি চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি দেখি কি একটা পনের-ষোল বছরের মেয়ে আমাদের বাড়ির গেটটা পার হচ্ছে। মেয়েটা কুচকুচে কালো। নিশ্চয়ই জামরুলের সন্ধানে আসছে। এক পয়সার না দু-পয়সার কে জানে। গাধাটাকে সবচেয়ে ছোটো ছোটো জামরুল দেব ঠিক করলাম। কিন্তু মেয়েটা তো জামরুল গাছটার দিকে তাকিয়েই দেখছে না। সে সোজা আমার দিকে এসে আমাকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। তারপর বলল,—আমি আপনাকে জানি। আপনার সব বই আমি পড়েছি। বাবার কাছে শুনলাম যে আপনি এসেছেন

তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার অটোগ্রাফে আপনাকে কিছু লিখে দিতে হবে।

যাক্ আমার মান রক্ষে হল। হে সুন্দরী! তোমার মঙ্গল হোক! আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নাম কি?

—সুহাসিনী।

—কোন্ ক্লাসে পড়?

—ক্লাস টেনে।

—তুমি কোন্ বাড়ির মেয়ে?

—আমি মাধবন কুলীর মেয়ে।

একটা মজুরের মেয়ে!! মজুরদের জয় হোক্।

আমি ঘরে গিয়ে কলম নিয়ে এসে সুহাসিনীর অটোগ্রাফে 'সুহাসিনীর সর্বমঙ্গল কামনা করি' বলে লিখে তাতে সই করে দিলাম। তারপর সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম,—সুহাসিনী, তুমি জামরুল খাও?

—খাই।

আমি একটা কাগজ নিয়ে জামরুল গাছে চড়ে পঞ্চাশটা বড়ো বড়ো জামরুল পেড়ে কাগজে মুড়ে সুহাসিনীকে দিলাম। বললাম, সুহাসিনী, এই জামরুল গাছটা আমি নিজের হাতে পুঁতেছি, বড়ো করেছি।

—সত্যি?

—সত্যি?

ও আবার আমাকে নমস্কার করে চলে গেল। সেদিন রাতে আমি একটা বিশেষ খবর শুনলাম। পাতুম্মার ছাগল নাকি শীঘ্র প্রসব করবে। এই বিশেষ খবরটা আমি এতদিন জানতে পারি নি কেন? ছাগলটা যে গর্ভবতী আছে তা ওকে দেখে মনেই হত না। ওর পেটটা কখনও ফোলা ফোলা, কখনও একেবারে সিঁটিয়ে গেছে বলে মনে হত। গর্ভবতী থাকলে কি পেট ও রকম পড়ে যায় নাকি? আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আম্মা বলল—হ্যাঁ, পাতুম্মার ছাগলের শীগগির বাচ্চা হবে।

আমার সন্দেহ তবু যায় না।

তিন

পাতুম্মার ছাগল তা হলে প্রসব করতে চলেছে। ভালো কথা, প্রসব করুক। আমার সত্যিই খুব ভালো লাগল।

আনুম্মা আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা ঝেড়ে রোদে দেবার সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছাগলটাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?

ছাগলকে ফেন দেওয়া হয়েছে, আনুম্মা বলল।

—শুধু ফেন দিলে কি হয় নাকি? ওকে ঘাস দিতে হবে। কিছু খোল কিনে পানিতে ভিজিয়ে দিলে আরো ভালো।

অনেক কলার খোসা আর একটা ছোটো কলা ছাগলটাকে দেবার জন্যে আমি আনুম্মাকে বললাম। আনুম্মা আমার চোখের সামনে সেগুলো সব ছাগলটাকে খাওয়ালো আমি দেখলাম, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হল, মেয়েরা সবকিছুতেই অথরিটি এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তবু ছাগলটার গর্ভ হওয়ার ব্যাপারে মেয়েরা যেন কোথায় একটা ভুল করেছে বলে আমার মনে হল। আমার খুব মজা লাগছিল। তার কারণ আমার সামনে যে ছাগলটা দাঁড়িয়ে আছে তার বাচ্চা হবার কোনো লক্ষণ নেই। পেট একবারে চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে। জামরুল গাছের তলায় পড়ে থাকা জামরুলগুলো ছাগলটা খাচ্ছিল। ওটার সঙ্গে আম্মাও রয়েছে দেখলাম। আম্মা জামরুল বেছে বেছে তুলছে।

লাল বড়ো বড়ো শিশির ফোঁটার মতো সবুজ পাতার আড়ালে ঘন হয়ে থাকা জামরুলগুলো আমার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন হাসছে।

আমি ঐ ভাবে বসে আছি তখন পাতুম্মা এল। আশ্চর্য! ওর সঙ্গে একটা ছাগল আর ওর মেয়ে খাদিজা, পাতুম্মার সঙ্গের ছাগলটার বাচ্চা হবে। আমি আনুম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ছাগলটা তা হলে কার?

—ওটা আমার। আপা দিয়েছে।

অর্থাৎ পাতুম্মা আনুম্মাকে দিয়েছে।

আম্মা বলল ওটা পাতুম্মার ছাগলের বড়ো মেয়ে।

ওঃ তা হলে আনুম্মারও একটা ছাগল আছে আর সেটা আমার আশেপাশেই থাকে, আমি এতদিন তা জানতাম না। ছাগল দুটোকে আলাদা করে চেনাও যায় না। দুটোই খয়েরী রঙের। একই রকম দেখতে। তারপর আমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে দেখতে পেলাম পাতুম্মার ছাগলটার চোখের চারপাশে একটা কালো দাগ রয়েছে।

এসেই ছাগলটা বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

আমি পাতুম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে পাতুম্মা তুই আর তোর ছাগল আজ এত দেরি করে যে?

পাতুম্মা কারণ ব্যক্ত করল। কোচ্চুন্নী ছাগলটার জন্যে যে ঘাস কেনে তাতে ওর খিদে মেটে না। ছাগলটার বাচ্চা হবে বলে ওর এখন ভীষণ খিদে। তাই দু একটা বাড়ি আর মাঠের থেকে অন্য লোকে ঘাস ছিঁড়ে নেওয়ার আগে ও ছাগলটাকে

সেখানে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল।

পাতুম্মা তারপর বাড়ির ভেতর গিয়ে ভাবী, ছোটোবোন আর ছোটো ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করল। পাতুম্মার ছাগলের জন্য যে ফেন রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়।

—ফেন সব ঐ আনুম্মা নিয়েছে ওর আদরের ছাগলকে খাওয়াবার জন্যে। তা তোমাদের আর সকলের কি এসব একটু দেখা উচিত্ না?

এক্ষুনি একটা চেচামেচি বাধবে। আমি আগ্রহভরে কান পেতে দিলাম। নাঃ কোনো ঝগড়াঝাঁটির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শুধু আম্মার গলা শোনা যাচ্ছে। সকলকে বকছে। শেষে আনুম্মার গলা শুনতে পেলাম, আমার ছাগলকে একটু ফেন দিয়েছি। খানিকটা আমরা খেয়েছি, বাকীটা তোমার ছাগলের জন্য রেখেছি।

আমার দেওয়া একঝুড়ি কলার খোসা যে আনুম্মার ছাগল খেয়েছে তা আর আমি বললাম না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব হয়েছে চুপ কর,—পাতুম্মার গলা।

তারপর পাতুম্মার অভিযোগ শোনা গেল,—আম্মা আমাকে দেখতে পারে না।

আম্মা বলল, টোপিওকা[১] সেদ্ধ খেয়ে একটু ফেন খেলে ভালো। আমরা তাই খানিকটা খেয়েছি। তোর ছাগলের জন্য সবটাই তো আগে রেখেছিলাম।

'টোপিওকা খাওয়ার পর একটু ফেন খাওয়া ভালো' আম্মা বলছে শুনতে পেলাম। টোপিওকা কখন খেল সব? খোঁজ নিতে সব ব্যাপার বুঝতে পারলাম। আম্মা, আনুম্মা, ঐশম্মা, কুঞ্জানুম্মা এদের কারুরই রোজ পেটভর্তি ভাত জোটে না। বাড়ির ছেলেদের আর বাচ্চাদের মাত্র ভাত জোটে। অন্যদের টোপিওকা, কাচিল,[২] গুঁড়ি কচু সেদ্ধ খেয়ে ভাতের অভাব মেটাতে হয়। সকাল এগারোটার সময় শুকনো টোপিওকা গুঁড়ো করে তাই ভাপে সেদ্ধ করে সব খায়। একটুখানি চা (তাও বেশির ভাগ সময় সুলেমান দেয় বলে) গরম জলে ফুটিয়ে দুধ চিনি ছাড়াই সব খায়। তারপর সংসারের অজস্র কাজ।

ছেলেরা খাবার সময় খেতে আসে, মেয়েরাই শুধু কষ্ট ভোগ করে। এ শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়, বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অবস্থা। মেয়েরা যে কতখানি স্বার্থত্যাগ করে চলেছে ছেলেরা তা জানতেও পারে না।

আবদুল কাদেরের বউ কুঞ্জানুম্মার গলা শুনতে পেলাম, পাতুম্মা, ছাগলটার বাচ্চা হলে আমাদের ভুলে যেয়ো না। সুবেদাকে একটু দুধ দিতে হবে।

হানিফার বউ ঐশম্মা জিজ্ঞেস করল, আর আমার রশীদের বুঝি গলা দিয়ে দুধ

---

১. আলু কচুর মতো কন্দজাতীয় একপ্রকার তরকারী। কেরালার গরিব লোকদের একটি প্রধান খাদ্য।
২. কন্দ জাতীয় আর একরকমের তরকারী।

নামবে না? সুলেমানের বউ আনুম্মা বলল, আমার সেয়দু মহম্মদেরও দুধ খেলে পেটের অসুখ করবে না।

আনুম্মা স্কুলে পড়েছে। পাতুম্মা পড়াশুনো করে নি তাই বলল,—হয়েছে হয়েছে তোর আর এ্যাঁকাব্যাঁকা কথা বলতে হবে না।

একটু পরে আমি ঘরে ঢুকে দেখি পাতুম্মার ছাগল আমার বাক্সের ওপর রাখা দুটো বড় বড় কলা মুখে পুরেছে। পাতুম্মার ছাগলই। ছাগলটা পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছে। দরজাটা বন্ধ করতে আনুম্মা ভুলে গিয়েছিল।

আমি চীৎকার করলাম,—আনুম্মা, পাতুম্মা, তোদের ছাগল আমার সব কলা খেয়ে নিল। শীগগির আয়।

আনুম্মা আর পাতুম্মা দুজনেই ছুটে এল। আনুম্মা খুব খুশি হল। বলল, এটা তো আপার ছাগল।

—যাকগে ভাইসাহেব। আমি তোমাকে দুটো কলা কিনে দেব। বেচারী খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে।

আনুম্মা বলল, কি রাক্ষুসে খিদে বাপু তোমার ছাগলের যে আমার ছাগলটার ঘাস পর্যন্ত চুরি করে খায়।

পাতুম্মা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। তুই আর তোর ছাগলের ঘাস!

আমি বললাম, ঠিক আছে। তুই বাচ্চাদের সব তোর ছাগলের দুধ দিস, তা হলেই হবে।

—কি করে দেব? আমার বুঝি পয়সার দরকার নেই? দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে আমাদের ঘরের দরজা সারাতে হবে।

কি যে করা যায়? পাতুম্মা, কোচ্চুন্নী আর খাদিজা যে বাড়িতে থাকে তার দরজা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। সেটা ঠিক করতে হবে।

আমি যাবার আগে বাড়ির মেয়েদের একবার অন্ততঃ পেট ভরে ভাত খাওয়াতে হবে।

তার জন্যে পয়সা কোথায় পাব? আমার হাতে এখন একটা আধলা পর্যন্ত নেই। যা ছিল তা সকলকে দিয়ে দিয়েছি সমানভাবে ভাগ করে। আমি সকলকে দিয়েছি বলাটা অবশ্য ভদ্রোচিত। সত্যি কথা বললে বলতে হয় যে আমার কাছ থেকে সকলে জোর করে আদায় করে নিয়েছে। তারপর আমাকে খালিহাতে এরকমভাবে বসিয়ে রেখেছে। ভাবলেই আমার রাগ ধরে। আমি কী না দিয়েছি? টাকা দিয়েছি। বাসনপত্র কিনে দিয়েছি। গ্লাস কিনে দিয়েছি। কাপড়চোপড় কিনে দিয়েছি। এতসব দিয়েও আমি যেন কাউকেই কিছু দিই নি এমনি ব্যবহার করে আমার সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেরা। সত্যি আমার ভীষণ রাগ ধরছে। কেউ কিছু বললে এখন সকলের ওপর চড়াও করব। আবু, হানিফা, আবদুল কাদের, সুলেমান সকলকে গালাগালি করব।

ছেলেমেয়েদের মারব। পাতুম্মার মেয়ে খাদিজাকেই শুধু মারি না ওকে দুষ্টুমি করতে দেখি না বলে। কাউকেই আমি ছাড়ি না। মেয়েদেরও বকুনি দিই। আমি যখন চেঁচামেচি শুরু করি তখন সারা বাড়ি শান্ত হয়ে যায়। চেঁচামেচির পর আমি চুপচাপ বসে থাকি।

পাতুম্মার ছাগলটা উঠোনে দাঁড়িয়ে শুকনো কাঁঠাল পাতা খাচ্ছে। বাচ্চা হলে ওর প্রচুর দুধ হবে। সুবেদা, রশীদ, খাদিজা, আবী, সেয়দু মহম্মদ, পাতুকুট্টি সকলেই একটু করে দুধ পেলে ওদের স্বাস্থ্যটাও একটু ভালো হবে। তবে দুধ, ঘি, এসব কিছু আমার বাড়ির লোকেরা ব্যবহার করে না। ঘি আমি খাই, দুধও। আমারটা অবশ্য একটু আলাদা ব্যাপার। দুধ আর ঘির কথা বলতে গিয়ে আর একটা ঘটনার কথা মনে হল।

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। বাড়িতে তখন আমি, আবদুল কাদের, হানিফা আর পাতুম্মা। অন্য ভাইবোনেরা তখনো হয় নি। বাড়িতে গরু ছিল। প্রচুর দুধ, দই আর ঘি হত। কাঠের ব্যবসা ছাড়াও আব্বার নৌকোর ব্যবসা ছিল। বন থেকে কাঠ কেটে ওখানেই নৌকো তৈরি করে নদীর ধারে এনে বিক্রি করা ছিল তাঁর কাজ। বাড়িতে তখন সব সময় ঘিয়ের ছড়াছড়ি। হলদে মোটা মোটা দানাওয়ালা ঘি। সেই ঘি বোয়েম বোয়েম ভর্তি থাকত। কুডায়াত্তুর পাহাড়ের কাছে যে ঘন বন আছে সেই বনের ঘাস খাওয়া গরুর দুধ। আর সেই দুধ থেকে ঘি। ঘিয়ের বোয়েমের কাছে চিনির বোয়েমও থাকত এক কোণে একটা কাঠের সেলফের ওপর। পোলাও, পরোটা মাংস সবেতে খুব ঘি ঢালা হত।

তখন আমি আব্বার হাতে খুব মার খেতাম। আবদুল কাদেরকে আব্বা একটুও মারতেন না কারণ ও ছিল ল্যাংড়া। আমাকে কারণে অকারণে মার খেতে হত। আব্বাদের সন্তানদের মারার অধিকার আছে। ওঃ হ্যাঁ, আমার আম্মাও আমাকে মারত। হাতার বাড়ি মেরে রান্নাঘর থেকে আমার আম্মা অনেক দিন আমাকে বার করে দিয়েছে। তখন কত কী যে খেতে ইচ্ছে করত। রান্নাঘরে ঢুকে কোনো কিছুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খাবার নিতাম। অমনিভাবে আবদুল কাদেরও খেয়েছে। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করত না। ও যদি চুরি করে খেত তার মারটা পড়ত আমার ওপর।

সেই সময় একদিন সকালে চা জলখাবার সময়ের পর ভাত খাওয়ার আগের সময়টা। একটু একটু খিদে পাচ্ছে। হাল্কা কিছু খাওয়ার এই হচ্ছে সময়। আমি রান্নাঘরের দিকে গেলাম। সেখানে আম্মা আর ঝিটা ছিল। ঝি-এর নাম নাঙ্গেলী। এই নাঙ্গেলীটাও আমাকে মারত। আমি হচ্ছি মনিব, বয়স হয়তো আমার অল্প। তবু অল্পবয়সী মনিবকে তার ভৃত্য মারে নাকি? নাঙ্গেলী এসব প্রভু-ভৃত্যের ধার ধারত না। আম্মাকে বললে বলত, বেশ করেছে মেরেছে। তুই তোর ঐ নোংরা হাত কেন খাবার জিনিসের মধ্যে ঢোকাস?

তা সেদিন আমি ভাবলাম একটা কাঁচা আম খাব। কিন্তু কি করে আমটা হস্তগত করা যায়? নাঙ্গেলীকে বললে বলবে—একটুখানি খিদে চেপে থাক্। এই তো খাওয়ার সময় হয়ে এলো। বেশি বিরক্ত করলে মার খাবি।

হতাশ হয়ে রান্নাঘর থেকে চলে এসে আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। ঘি আর চিনি পাশাপাশি রয়েছে। দুটোয় মিশোলে খেতে কিছু খারাপ হবে না। ব্যস্ আর দেখে কে? আমি লুকিয়ে একটা বাটি জোগাড় করলাম তারপর চুপি চুপি আব্বার শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঘিয়ের বোয়েমটা আস্তে আস্তে আব্বার খাটে নামালাম। ঢাকাটা আস্তে আস্তে খুলে আমার পরিষ্কার হাতটা দিয়ে ঘি নিয়ে বাটির আদ্ধেকটা ভর্তি করলাম। তারপর বোয়েমটা নিয়ে সেলফে রেখে দিলাম। চিনিও অমনিভাবে অনেকটা বাটির মধ্যে ঢাললাম। সেটাও খুব সাবধানে সেলফে রাখলাম। এমনভাবে রাখলাম যে কেউ বুঝতেও পারবে না যে বোয়েম দুটো নিয়ে কেউ নাড়াচাড়া করেছে। তারপর আব্বার খাটে বসে ঘি আর চিনি একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে খানিকটা মুখে পুরে কুড়্মুড়্ শব্দ করে খেতে লাগলাম। বেশ মোটা দানাদার চিনি। ঘিয়ের সঙ্গে খুব ভালো করে মেশেনি। খেতে বেশ লাগছে হঠাৎ খুব আস্তে কে যেন আমাকে একটা কী জিজ্ঞেস করল। আমি চমকে উঠলাম। প্রশ্নকর্তা আবদুল কাদের। ও আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কখন, কি করে ঐ ঘরে এলো কে জানে? ও খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো,—ভাইসাহেব তুমি কী খাচ্ছ?

আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম,—একটা ওষুধ।

—আমি তোমার পেছনেই ছিলাম। সব দেখেছি। আমাকেও দাও নইলে আমি এক্ষুনি বলে দেব।

—তুই আমার ছোটো ভাই না? আমার নামে তুই বলবি?

—আমাকেও দাও।

আমি ওকে দিতে বাধ্য হলাম। বাটিটা চেটে পরিষ্কার করল ও।

—আমি আর কোনোদিন নেব না, তুইও নিস না, কেমন?

আমার দুজনে বাইরে এলাম। বাটিটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে আমরা চুপ করে রইলাম।

আমি আর একদিনও ঘি আর চিনি নিই নি। এ একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। ঘি-এর আসল গুণের কথা কিছু জানতাম না তবে ঘি আর চিনি মিশিয়ে খেতে ভালো লাগে তাই খেতাম। খাওয়ার অনেক জিনিসই বাড়িতে আছে। পাকা কাঁঠাল, আম, আনারস, কলা। ভাজা মাংস বোয়েমে ভর্তি করে আলমারীতে রাখা আছে। আমি কিন্তু নিই না। এমনিভাবে দিন কাটছে হঠাৎ আবদুল কাদের খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে আমি নিয়মিত মার খাচ্ছি।

আমি মার খাচ্ছিলাম এইজন্যে যে কে যেন রোজ রোজ ঘি চুরি করে খাচ্ছিল। বোয়েমের গায়ে, খাটে তার দাগ লেগে থাকত। আমাকেই চোর মনে করে সকলে আমাকে দু-চার ঘা মারছিল।

আবদুল কাদেরের অসুখটা খুব মজার। ও দিন দিন শুয়োরের মতো ফুলছিল আর সবসময় জল খাচ্ছিল। খাওয়াদাওয়ায় একেবারে রুচি নেই।

আম্মা আর নাঙ্গেলী বলল, ছেলেটার কি একটা অসুখ হয়েছে।

আব্বা কানিয়ানকে ডাকতে গেল। কানিয়ান ছিল তখনকার নাম করা বৈদ্য।

আম্মা আবদুল কাদেরকে কোলে নিয়ে ওর সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল, ছেলেটার কি হল গো?

নাঙ্গেলীও বলল—আল্লাহ, ছেলেটার যেন কিছু না হয়।

কিন্তু রোগীর কোনো দুঃখ নেই। দিনকে দিন ও মোটা আর অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাতে ওর কোনো চিন্তাই নেই। আমার সন্দেহ জাগলো। আমি ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকালাম। বেটা চোর, সমস্ত ঘি চুরি করে খেয়ে ঐ রকম হিপ্পোর মতো মোটা হয়ে বসে আছে।

বৈদ্য এল কিন্তু তার ওষুধে কোনো কাজ দিল না। তখন আর একজন বৈদ্য এল; হাকিম এল, অসুখ কিন্তু সারে না।

এমনিভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এদিকে বোয়েমের ঘিও কমে আসছে আর সব মারটা খাচ্ছি আমি। আবদুল কাদের দিনকে দিন ফুলছে। ওষুধ বিষুধ ও কিছুই খাচ্ছিল না। কেউ যখন থাকে না ওষুধ সব ও ফেলে দেয়। কখনো কখনো অল্প দুটি ভাত খায়। বেচারার অসুখ সারছে না দেখে সকলেরই ওর ওপর একটা দয়া দয়া ভাব। ওর কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই।

আমি জানি যে ও ঘি আর চিনি চুরি করে খাচ্ছে কিন্তু কাকেই বা বলব, বললে কেই বা বিশ্বাস করবে? একদিন ওকে আমি অনেকখানি ভাজা মাংস আলমারী থেকে চুরি করে খেতে দিলাম। এটাকে অবশ্য একরকম ঘুষই বলা যায়। ও যখন খাচ্ছিল আমি বললাম,—শোন্ তুই আমার ছোটো ভাই, আমাকে সত্যি কথা বল্। তুই যে এরকম হাতির মতো মোটা হচ্ছিস তার কারণটা আমি জানি। রোজ রোজ ঘি আর চিনি চুরি করে খেয়ে তোর এই অবস্থা—তাই না?

—বাজে বোকো না ভাইসাহেব। দেখতে পাচ্ছ না আমার অসুখ করেছে?

ওর এই নষ্টামি আমি কি করে আর সকলের কাছে প্রমাণ করি? তবু আম্মাকে, নাঙ্গেলীকেও বললাম কিভাবে রোজ রোজ চুরি করে ঘি আর চিনি খেয়ে আবদুল কাদেরের এই অবস্থা।

যেরকম ভেবেছিলাম—কেউ বিশ্বাস করল না আমার কথা। যাক্ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সব প্রমাণ হয়ে গেল। সেদিন ছিল শুক্রবার। আব্বা

মসজিদে গেছেন। আম্মা পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। আবদুল কাদেরের অসুখের গল্পও তার সঙ্গে আছে। আমি সেসব শুনে বাড়ি এলাম; নাঙ্গেলী ঘুমোচ্ছে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে এটা-সেটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। হাত দিয়ে ঘেঁটে কিছু খেলামও, তার পর বাইরের বারান্দাটা দিয়ে আস্তে আস্তে আসছি হঠাৎ আব্বার শোবার ঘরে কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটা কুড়মুড় শব্দ—আমি খুব চুপিচুপি দেখলাম যে আব্বার খাটের তলায় দুটো পা। একটা শুকনো পা। আবদুল কাদের ঘি আর চিনি খাচ্ছে।

আমি আস্তে খুব আস্তে বাইরে এসে দৌড়ে গিয়ে আম্মাকে ডেকে আনলাম।

—আবদুল কাদেরের অসুখটা কী একবার দেখে যাও।

আমি সবাইকে ডেকে এনে আস্তে আস্তে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলাম, তার পর ভেতরে ঢুকে সবাইকে ভেতরে আসতে বললাম।

আবদুল কাদের বেশ গর্তওয়ালা একটা বাটি চিনি আর ঘিয়ে ভর্তি করে খাটের তলায় বসে আরামসে খাচ্ছে।

আমি ওকে খাটের তলা থেকে টেনে বার করলাম। আম্মা ওকে যা মারটা দিল। গোলমালে নাঙ্গেলী উঠে পড়ল। সব শুনে সেও দু-চার ঘা লাগাল।

উঃ আমার যা মজা লাগছিল তার আর বলার নয়। আব্বা বাড়িতে এসে জানতে পেরে ওকে আচ্ছাসে মারলেন।

মারধোর শেষ হবার পর আমরা দুজনে যখন একা তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করল—আমি তোমার ছোটো ভাই না? আমাকে দেখিয়ে দিলে কেন?

আমি বললাম, বেটা চোর। তোর জন্যে আমি কত মার খেয়েছি জানিস? তখন আমি তোর বড়ো ভাই মনে ছিল না—না? বেশ হয়েছে মার খেয়েছিস।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের মনেই হাসছিলাম। তখন আম্মা এল। কী রে, আপন মনে হাসছিস যে?

—পুরোনো কথা মনে করে হাসছিলাম। আবদুল কাদেরের সেই ঘি আর চিনি চুরি করে খাওয়ার কথা মনে আছে?

—ওঃ সে কথা তুই এখনো ভুলিস নি?

—না।

—শোন্, তোর কাছে টাকা থাকলে গোটা পাঁচেক টাকা দে। পাতুম্মার ছাগলটা ভাতের হাড়ি ভেঙে ফেলেছে।

পাতুম্মা বলল—না ভাইসাহেব। আমার ছাগল নয়, আনুম্মার ছাগল বোধহয়।

আনুম্মা শুনে বলল—আমার ছাগল কখনো এ রকম কুকাজ করবে না। এ তোমার ছাগল!

পাতুম্মা বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। হয়েছে। একটু ভদ্দরভাবে কথা বলতে শেখ।

আমার ছাগল তুই জানলি কি করে? মনে হল আর বললি?

আনুম্মা বলল, শোনো ভাইসাহেব, এটা আপার ছাগল। আপার ছাগলটা আসতেই আমি আমার ছাগলটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। আপার ছাগলটা আমার ছাগলের ঘাসগুলো চুরি করে খাবে, আমাদের টোপিওকা সেটা চুরি করে খাবে। আমাদের দুধ না দেওয়া চা পর্যন্ত খেয়ে নেবে। বাচ্চাদের খাবার দেখতে পেলে খাবে। আম্মার ছাগল সব খাবে। এমন রাক্ষুসে ছাগল।

পাতুম্মা বলল—আর তোর ছাগলটা একেবারে ফকির। কোনো কিছু চুরি না করে খায়। বলি তুই এই ছাগলটাকে পেলি কোত্থেকে—অ্যাঁ?

—ছাগলটা তুমিই আমাকে দিয়েছ।

—তা হলে তুই দেখ্। এই দুনিয়ায় কজন আপা তাদের ছোটোবোনদের ছাগল ভেট দেয়।

—উঁ...কত আপা কত ছোটবোনকে হাতি পর্যন্ত উপহার দেয়। তুমি তো দিয়েছ কেঁচোর মতো একটা ছাগল।

পাতুম্মার রাগ চড়ে গেল, কী নেমকহারাম রে তুই। ভাইসাহেব আছে বলে বেঁচে গেলি, নইলে তোকে আমি দেখতাম। আমার দুটো ছাগল ছিল তার একটা আমি আদর করে আমার ছোটবোনকে দিয়েছি অথচ তুই কী অকৃতজ্ঞ!

তারপর পাতুম্মা আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, খাদিজার দুলের কথা ভোল নি তো?

আমিও খুব আস্তে আস্তে বললাম—ভুলি নি।

পাতুম্মা আরো আস্তে আস্তে বলল, কেউ যেন জানতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে আনুম্মা আমার কাছে এল, আপা তোমাকে কী গোপন কথা বলছ গো?

পাতুম্মা চলে যাচ্ছিল, ছুটে এসে বলল—আমি কিছু বলি নি।

আনুম্মা বলল, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাদের লুকিয়ে ভাইসাহেবের কাছে কিছু চেয়েছ—না? ভাইসাহেব তুমি আপাকে কী দেবে গো?

তখন আর একদিক থেকে দুটো গলা শোনা গেল, আবদুল কাদেরের বউ কুঞ্জানুম্মা আর হানিফার বউ ঐশম্মার গলা : যদি সোনাদানা কিছু হয় তা হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন বাদ না পড়ে।

ওরা সব কি করে জানতে পারল যে পাতুম্মার মেয়েকে আমি সোনার দুল গড়িয়ে দেব। মেয়েদের যে জ্ঞানোদয় কিভাবে হয় তা কে জানে।

পাতুম্মা খুব রেগে গেল। বলল, খাদিজা, আমাদের ছাগলটাকে ডাক। আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব। আমাদের আর এ বাড়িতে পা দেবার দরকার নেই। কি সব অসভ্য রে বাবা।

আনুম্মা সব বুঝতে পেরেছে। ওর খুব মজা লাগল। বলল,—ওঃ তাই, তাই।

ভাইসাহেব, তুমি আপাকে সোনার কী জিনিস দেবে গো?

আমি বললাম, অর্থাৎ ঘোষণা করলাম, সকলে তা হলে শোনো।

খাদিজাকে আমি একজোড়া সোনার দুল দেব। হ্যাঁ, দেবই ঠিক করেছি। তোমাদের কোনো আপত্তি আছে?

আনুম্মা বলল—ভাইসাহেব, আমারো একজোড়া দুল চাই।

—হয়েছে, হয়েছে। কি হিংসুটে! তুই নতুন বাড়ি করে উঠে যাবার পর ভাইসাহেব তোর সংসারের সমস্ত বাসন-কোসন কিনে দেবে বলে তুই বলিস নি? ভাইসাহেব কথাও দিয়েছে যে কিনে দেবে। আমি সব জানতে পেরেছি। বুঝলি, আমি সব জানি।

আশ্চর্য! আনুম্মাকে আমি বাসন কিনে দেব এ গোপন কথা পাতুম্মা জানতে পারল কী করে?

চার

একটা গোলমাল শুনে আমি রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দেখি আম্মা আর বাড়ির মেয়েরা সব কাকে ঘিরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর একটু এগিয়ে দেখি পাতুম্মার ছাগল। ছাগলটার মাথা নেই অর্থাৎ ছাগলটা ওর মাথাটা একটা হাঁড়ির মধ্যে কেমন করে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর তা বের করতে না পেরে হাঁড়িসুদ্ধু ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে মানে মেয়েরা সব ওকে চেপে ধরে আছে। ছাগলটাকে কি করে হাঁড়িমুক্ত করা যায় তাই নিয়ে সকলে খুব চিন্তিত।

পাতুম্মার ছাগলের এই বদমাইশি আমি দেখে ফেললাম দেখে পাতুম্মা খুব অপমানিত বোধ করল। বলল, ছাগলটা তো এরকম কক্‌খনো করে না।

আমি একটা পাথর নিয়ে হাঁড়িটাকে ভেঙে ছাগলটাকে মুক্ত করলাম।

আম্মা বলল—ছিঃ ছিঃ করলি কি রে। অমন নতুন হাঁড়িটাকে ভাঙলি?

আমি খুব অপমানিত বোধ করে ওখান থেকে চলে এলাম। বারান্দায় এসে বসতেই আবদুল কাদেরের বড়ো মেয়ে পাতুকুট্টি ছুটে এসে আমাকে তার অভিযোগ জানাল।

—বড়ো চাচা, আবী আমাকে মেরেছে।

আবীও ছুটে এল, বলল—আব্বাও আমাকে মেরেছে।

ভবিষ্যতে আর মারামারি কোরো না বলে ওদের বিদায় করতে না করতেই সেয়দু মহম্মদ একটা কেস নিয়ে হাজির হল।

—বড়ো মামা, লায়লা আবার আমাকে 'কাঠকুড়ুনী' বলেছে।

কি সাংঘাতিক! একটা মেয়ে একটা ছেলেকে বলেছে 'কাঠকুড়ুনী'। লায়লাকে আমি ডাকলাম।

লায়লা এল, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এসেই বলল, বড়ো চাচাকে আমি নিয়ে যাব না।

—যাস না। সেয়দু মহম্মদ, শিগগির একটা লাঠি নিয়ে আয়।

সেয়দু মহম্মদ কাঁঠাল গাছের একটা ডাল নিয়ে এল। তাই দিয়ে লায়লাকে ভয় দেখিয়ে ভবিষ্যতে আর কাউকেও যেন 'কাঠকুড়ুনী, ঘুঁটেকুড়ুনী' বলে গালাগালি না দেয় বলে শাসিয়ে ওদের বিদায় করলাম। কতকগুলি মুরগী হঠাৎ ভীষণ চীৎকার করতে করতে উড়ে এসে ইজিচেয়ারে আমার কোলের ওপর এসে পড়ল। তাদের পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে পাতুম্মার ছাগল, ব্যাপারটা খুব গুরুতর নয়। পাতুম্মার ছাগল আরো একটা ভাতের হাঁড়ি ভেঙেছে। আনুম্মা আর ঐশম্মার চীৎকার শোনা যাচ্ছে সঙ্গে আম্মার বকুনি। বাচ্চাদের হাসি আর পাতুম্মার অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া, কথাবার্তা আমি শুনতে পাচ্ছি। আর 'আমি কিছুই জানি না' এমনিভাবে কাঁঠালতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পাতুম্মার ছাগল।

বেলা চারটের সময় আমি একটু বেড়াতে বেরোলাম। ঘুরতে ঘুরতে বাজারের কাছে এলাম। খুব একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। একঝুড়ি ভর্তি জামরুল নিয়ে আবী আর পাতুকুট্টি হাটের লোকেদের মধ্যে বসে আছে। যেন হাজার হাজার হাতির মধ্যে ছোট্ট দুটো ইঁদুর। ওরা জামরুল বিক্রি করছে, বিক্রেতা আবী।

—পাঁচে এক পয়সা, দুপাঁচ একে—দু পয়সা; অর্থাৎ পাঁচটা জামরুলের দাম এক পয়সা, এগারোটার দাম দু পয়সা। আবী ওর হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে দাম হাঁকছে। তাদের এই বেচা আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ওরা দু আনার বিক্রি করল। পয়সাটা আমি ওদের কাছ থেকে নিলাম।

সেদিন রাতে আম্মার হাতে আমি আট আনা দিলাম। আম্মা খুব খুশি হল। ভাত খেয়ে শোবার আগে সেদিন রাতে আমি আব্বাদের কিভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয় সে সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলাম। বাড়ির মেয়েদের পেট ভরে খেতে দেওয়া সম্বন্ধেও বললাম। বাচ্চাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধেও উপদেশ দিলাম। বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথাও বললাম। সবকিছু শুনে হানিফা বলল—আমি আর্মিতে চলে যাচ্ছি।

আবু বলল—ভাইসাহেব, তুমি নিজে একটু দেখাশোনা করলেই পারো, কিছু টাকা অবশ্য গরচা দিতে হবে। আমাদের বাড়ির ওপরটা বদলে টালি লাগাতে হবে। তুমি এসেছ বলে তবু উঠোনটা একটু ঠিক হয়েছে।

উঠোনটা ভালো করে বাঁধিয়েছি আমি, তার জন্যে পয়সা খরচ করেছি আমি।

আবদুল কাদের বলল—ভাইসাহেবকে সবসময় চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। পাতুম্মার

ছাগলটার বাচ্চা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এমনিভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন পাতুম্মার ছাগল প্রসব করল।

দুপুরবেলাই হবে বোধহয় সেই শুভমুহূর্ত। সেদিন একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। খবরটা শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কত কী অঘটন এখন ঘটতে পারে। প্রসব করতে গিয়ে মরার অনেক ঘটনার কথা আমার মনে হল। আমার খুব খারাপ লাগছিল। আম্মাকে আমি হাজারবার ডেকে ব্যতিব্যস্ত করলাম।

—আম্মা তুমি ছাগলটার কাছে থাকো, আম্মাকে অনুরোধ করলাম। আম্মা কিছু বলল না দেখে আমার ভয় বেড়ে গেল। কী যে হবে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। একবার ওখানে গিয়ে দেখব নাকি? কিন্তু গিয়ে দেখার সাহসও হচ্ছিল না। যা হোক্ তবু একবার গিয়ে দেখলাম। ছাগলটাকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম ভিড় জমে আছে। আম্মা, কুঞ্জানুম্মা, আনুম্মা, ঐশম্মা, পাতুকুট্টি, আবী, আরিফা, সেয়দু মহম্মদ, রশীদ, সুবেদা—এরা ছাড়াও পাড়ার অনেক মেয়ে। মনে হচ্ছে যেন একটা উৎসব লেগে গেছে। প্রত্যেকেই কিন্তু খুব খুশি।

কারো কোনো ভাবনাচিন্তা নেই কেন? আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম পাতুম্মাকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে কি না?

পাতুম্মারই তো এখন এখানে থাকার কথা। আশ্চর্য! পাতুম্মাকে ডাকতে লোক পাঠানো হয় নি। আম্মা আর অন্যান্য মহিলারা যেন এ ব্যাপারটা গায়েই লাগাচ্ছে না। তখন আমার মনে হল ওদের এতে তো গা লাগাবার কথা নয়। কারণ ওরা একটা নয়, অনেক বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। আম্মাই তো কত জনের জন্ম দিয়েছে, তারপর তার মেয়েরা পাতুম্মা, আনুম্মা তারাও সন্তানের জন্ম দিয়েছে, আম্মার ছেলের বউরাও বাচ্চার জন্ম দিয়েছে ত'ই পাতুম্মার ছাগলের বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা ওদের কাছে একেবারে নিঃসার। কোথাও কোনো প্রসবের কথা শুনলে ওরা শুধু জিজ্ঞেস করে 'ছেলে, না মেয়ে'।

কিন্তু আমার এসবের সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় চেয়ারে আমি একা বসে আছি। একটা খবর জানতে পারছি না। ওদিকে যে কী ঘটছে কে জানে? আমি একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে চলেছি। একবার উঠে এদিক-ওদিক খানিকটা হাঁটাহাঁটি করলাম—অমনিভাবে হাঁটছি এমন সময় আবী আর পাতুকুট্টি এদিকে এল, আবী খুব জোরে জোরে বলছে,—আমি আগে দেখেছি।

পাতুকুট্টি বলল—তুই না, আমি আগে দেখেছি।

তারপর লায়লা আর সেয়দু মহম্মদ এল, সেয়দু মহম্মদ বলল—আমি আগে দেখেছি।

লায়লা বলল—তোকে আমি নতুন বাড়িতে নিয়ে যাব না, আমি আগে মাথা বার হতে দেখেছি।

এই বাচ্চাগুলো কে আগে দেখেছে বলে চেঁচামেচি করছে?

আমি আবীকে জিজ্ঞেস করলাম—কী রে, কী তুই দেখেছিস?

আবী বেশ গর্বের সঙ্গে বলল—ছাগলটার পেট থেকে কি করে বাচ্চা বেরোলো আমি তা আগে দেখেছি।

—ছাগলের বাচ্চা হয়ে গেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ, বাচ্চা হয়ে গেছে।

বেচারী পাতুম্মার ছাগল। যাক্ তবু ভালোয় ভালোয় যে বাচ্চাটা হয়ে গেছে এই রক্ষে। আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম, আমি গিয়ে দেখলাম যে গোয়ালঘরের একপাশে আম্মা আর বাচ্চা শুয়ে রয়েছে। বাচ্চাটার রঙটা সাদা—এই বিশাল পৃথিবীকে এতটুকু ভয় না পেয়ে ও পিটির পিটির করে দেখেছে। আমি যদি এখন কিছু জিজ্ঞেস করি তো তাই নিয়ে বাড়ির মেয়েরা হাসিঠাট্টা করবে, তবুও আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম—ছাগলটাকে কিছু খেতে দিয়েছ?

ছাগলটাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। একটু পরে কী যেন একরকম পাতা খেতে দেবে। তাই সচরাচর দেওয়া হয়ে থাকে।

আমি বললাম—বাচ্চাটাকে একটা মাদুরে শোয়াও। ঠাণ্ডা মাটির ওপর বেচারা শুয়ে আছে।

তারপর আমি তাড়াতাড়ি একটা খুব বড়ো কলা এনে ছাগলটাকে খেতে দিলাম। ও বেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে খেল।

'আমি এসব করছি কী' এইভেবে মেয়েরা সব আমার দিকে দেখছিল; শুধু আম্মা মৃদু মৃদু হাসছিল।

সন্ধের পর পাতুম্মা, খাদিজা আর কোচ্চুন্নী এল। ছাগলটার বাচ্চা হয়েছে শুনে ওরা কেউ কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। রাতে শোয়ার সময় আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম—ছাগলের বাচ্চাটাকে কোথায় রাখা হয়েছে?

—রান্নাঘরে—কে যেন বলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—উনুনে আগুন নেই?

আম্মা বলল—বাচ্চাটাকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

—আনুম্মা, বাচ্চাটার দম বন্ধ হয়ে যাবে না? তোদের বাচ্চাদের এরকম ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখবি?—আমি বলে ফেললাম?

—তা বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করতে হবে?—এইরকম একটা উত্তর শুনতে পেলাম। কে যে বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি আর কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে

পড়লাম। এই প্রসব করা মেয়েদের আমি যা কিছুই বলি তা যেন একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমার অনুপস্থিতিতে তারা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি সাদী করি নি তাই যে বিষয়ে কিছু জানি না সে বিষয়ে কোনো কথাবার্তা না বলাই ভালো, এইরকম এদের ভাবখানা। ঠিক আছে, আমিও আর কিছু বলব না। আমি গায়ে ঢাকা দিয়ে চোখ বুজলাম।

পরদিন সকালে গোসল করার পর চা খেতে খেতে আনুম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম—ওটাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?

ওটা যে কে তা আনুম্মা ভালো করেই জানে। ওটা মানে পাতুম্মার ছাগল।

ঘাস দিয়েছি—আনুম্মা বলল।

পাতুম্মার ছাগল আর তার ছানাটা উঠোনে কাঁঠাল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আম্মা বোধহয় বাচ্চাটাকে দেখাচ্ছে কোথা থেকে ওর খাবার পাওয়া যাবে। ছানাটা মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। ভালো করে হাঁটতেও পারছে না। ওটাকে নিয়ে একটু চুমু খেতে ইচ্ছে করল। তখনই দেখি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হানিফা। খালি গা, পরনে মুণ্ডু।

বলল—ভাইসাহেব দশটা টাকা চাই। ছোটো ভাইসাহেবের কাছে চাইলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তার সঙ্গে আবু যোগ দিয়ে আমাকে নিয়ে এমন হাসাহাসি করবে। দেখ আমার দিকে তাকিয়ে। আমার পয়সা থাকলে কি এরকম খালি গায়ে আমি ঘুরে বেড়াই?

—তুই কিছুদিন আগে আমার একটা ভালো মুণ্ডু আর একটা সার্ট নিয়েছিস মনে আছে?

—আমি? আমি তোমার জামাকাপড় নিয়েছি...? থাক্, আমার কিছু চাই না। আমি আর্মিতে চলে যাব। এ বাড়িতে আমার যদি প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো সরকারের আমাকে প্রয়োজন আছে। এইটুকু দয়া করে মনে রাখলেই হবে। তোমার মুণ্ডু আর সার্ট...

ওর কথার মধ্যেই আমি বললাম,—দাঁড়া, দাঁড়া! আমার মুণ্ডু আর সার্ট আমি তোকে দিই নি। কাপড় জামা কেচে এলে আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তুই ওগুলো নিয়ে নিয়েছিস। আমার কাছে বেশি জামা কাপড় নেই বলে যে কটা মুণ্ডু আর সার্ট আমার আছে তার সব হিসেব আছে। যখন বেশি ছিল তখন আম্মা নিয়েছে, আবদুল কাদের নিয়েছে, পাতুম্মা, আনুম্মা সকলেই নিয়েছে, শুধু তোর বউ আর আবদুল কাদেরের বউ নেয় নি।

হানিফা বলল—তোমার সার্ট আর মুণ্ডু আব্বু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিয়েছে। ভাইসাহেব আমার দশাটা তুমি দেখছ না?

—সুতোর মতো লিকলিকে আবু তোর মতো গাঁটাগোট্টার কাছ থেকে মুণ্ডু আর সার্ট কেড়ে নিয়েছিল?

—বেশ, তোমার যদি সন্দেহই হয় তা হলে আবীকেই জিজ্ঞেস করো না—এই আবী।

আবী এল। হানিফার সব কাজের এক সাক্ষী ওর ছেলে আবী। ও এসেই বলল—হ্যাঁ, আব্বা যা বলছে তা ঠিক। ছোটো চাচা কাপড় কেড়ে নিয়েছে আমি দেখেছি।

ঠিক এই সময় আধখোলা দরজার কাছে রশীদকে কোলে নিয়ে হানিফার বউ ঐশম্মা এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, আব্বা আর ছেলে দুজনেই মিথ্যে কথা বলছে। ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে আমি শুনেছি। আপনার মুণ্ডু আর সার্ট আবীর আব্বার স্যুটকেশের মধ্যে আছে।

—বেটা মিথ্যেবাদী! তুই আমাকে আর আবদুল কাদেরকে দিয়ে নারকেলের বাগলো বইয়েছিলি—মনে আছে?

হানিফা বলল—ওসব আমি কিছু জানি না। আমি পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে রোজগার করা এক সামান্য মজুর।

—আর তোর যে কলাবাগান আছে?।

—সে আমি তোমায় দিয়ে দেব শুধু দশ হাজার টাকা দিলেই হবে।

বেটা এর দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে ঐ কলাবাগান কিনেছে। আমি তো জানি সব।

আমি আম্মাকে ডাকলাম। আম্মা এলে পর বললাম—আম্মা, তোমার মনে আছে হানিফা যখন ছোটো ছিল তখন ও একবার পাঁচ টাকা চুরি করেছিল—মনে আছে? তারপর বেটা যেন বড়ো মালিক এমনিভাবে ওর বড় ভাই আমাকে আর আবদুল কাদেরকে দিয়ে পাহাড়ের মতো উঁচু এক বোঝা বাগলো বইয়েছিল। শুধুই এতেই হয় নি। আমদের রোজ এক আনা করে মজুরী দিত। এমনি ভাবে পাঁচ-সাত দিন কাটার পর আব্বা জানতে পারল। বাগলোগুলো আমার চুরি করার উদ্দেশ্য আছে ভেবে আব্বা আমাকে কী ভীষণ মেরেছিল। আম্মা তোমার মনে আছে সেসব কথা?

আম্মা বলল—হানিফা ওর আব্বার বাক্স থেকে চুরি করত না। সে সময় আমার পানের ডিব্বেতে ভর্তি রুপোর টাকা পয়সা থাকত। এ কিরকম করে চুরি করত জানিস? নাঃ থাক্। আমি বলতে চাই না। ওর বড়ো ছেলেমেয়েরা শুনবে।

—বলো, বলো ওরা শুনুক।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আম্মার পানের ডিব্বে থেকে রুপোর পয়সা চুরি করা আমার একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি আম্মার সঙ্গে গিয়ে শুই। আম্মার একটু ঢুলুনি আসতেই আম্মার কোমর থেকে ডিবেটা নিয়ে তার থেকে চারটে পয়সা নিয়ে আবার চুপিচুপি ডিব্বেটা আম্মার কোমরে গুঁজে রেখে দিই। আম্মা জানতেও পারে না। তারপর ওখান থেকে উঠে পড়ি।

আম্মা বলল, হানিফা বড়ো হয়েও দুধ খাওয়া ছাড়ে নি। দুধ খেতে খেতে বদমাইশটা আমার ডিব্বেটা থেকে পয়সা চুরি করত। একবার আমি ধরে ফেলেছিলাম। সেদিন ওকে আমি এমন মার মেরেছিলাম যে তারপর থেকে ওর দুধ খাওয়াও বন্ধ হয়েছিল।

বাঃ বাঃ কি রকম আম্মা আমার! আর আবদুল কাদের ভাইসাহেব বুঝি চুরি করে নি?

—হ্যাঁ ও'ও চুরি করেছে একমাত্র তোর বড়ো ভাইসাহেব ছাড়া।

—ওঃ আমি কি ভালো লোক রে!

—শুনলি তো হানিফা? আবী, লায়লা তোরা সব শুনলি তো?

হানিফা বলল—আম্মা, তোমার মনে নেই তাই, নইলে এরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে আর তুমি বেশ বাজে কথাগুলো বলে যাচ্ছ। ভাইসাহেব তোমার ডিব্বেটা থেকে কতদিন পয়সা চুরি করেছে। আমার খুব ভালো মনে আছে। আম্মাকে আর আবদুল কাদের ভাইসাহেবকে বড়ো ভাইসাহেব কতদিন চা কিনে খাইয়েছে। ভাইসাহেব চায়ের দাম দিত কোত্থেকে? ওর পয়সা তখন আসত কোত্থেকে? বলো আম্মা, তুমিই বলো।

আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করলাম।

—এই তুই আমার কাছ থেকে অনেকবার দু-পাঁচ টাকা নিয়েছিস। সে টাকা কোনোদিন ফেরত দিস নি। তা ছাড়াও তুই আমার কাছে একশো টাকা ধারিস্। তার সাক্ষী আছে খৃশ্চান, নায়ার আর ইড়বা তোর সব বন্ধুরা। আমি তাদের সাক্ষী হিসেবে এক্ষুনি আম্মার সামনে দাঁড় করাচ্ছি। বার কর একশোটা টাকা।

—আম্মা, শুনছ ভাইসাহেবের কথা? আমি নাকি ওর কাছে একশো টাকা ধারি। আর আমি যে তোমাকে কলা আর আনারস কিনে খাইয়েছি আর এন্তার বিড়ি—এগুলো সব বুঝি এমনি এসেছে। তা ছাড়া ঢ্যাড়স, উচ্ছে, ছাগলের লিভার, হাঁসের ডিম, মাছ, কাঁঠাল এসবের পাওনা হিসাবে তোমার কাছে আমার চল্লিশ টাকা প্রাপ্য। তার থেকে গোটা দশেক টাকা আমি এখন চাইছি।

—তুই আমাকে সব কিনে খাইয়েছিস্? তোর কলাবাগানের মাটিতে পড়া কাঁচা কলাগুলোকে রঙ করে সেই কলা আমাকে খাইয়েছিস। আর যেসব জিনিসের কথা বলছিস তা আবদুল কাদের, কোচ্চুন্নী সুলেমান পয়সা দিয়ে দিয়ে কিনে তোর হাতে দিয়েছে। তুই এখানে আসার সময় বয়ে নিয়ে এসেছিস মাত্র। যেন তুই কিনে এনেছিস এমনিভাব করে দিতিস।

এসব শুনে হানিফা বলল, ঐশম্মা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে এসো। আমাদের আর এ বাড়িতে থাকার দরকার নেই। আমাদের কলাবাগানে কোনোরকমে নারকেল পাতার ছাউনী দিয়ে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকব। এসো, চলে এসো।

আমি বললাম, দাঁড়া, দাঁড়া, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাবি? ঐ একশোটা টাকার হিসেবটা দিয়ে যা। আম্মা শোনো—এটার তখন একটা সাইকেল ছিল। এই তো সেদিনের কথা। তখন আমি যখন বাড়ি আসতাম ওর সাইকেলটা নিয়ে চালাতাম। দশ মিনিট পরে সাইকেল ফেরত দিলে ও বলত—দু ঘণ্টা হয়েছে তুমি আমার সাইকেল নিয়েছ, অর্থাৎ ওর সাইকেলের ভাড়া চাই। আর তখন এর কাজ কি ছিল জানো? এ ওর সব খৃশ্চান, নায়ার, ইড়বা বন্ধুদের নিয়ে আমার কাছে এর্ণাকুলমে আসত। আবীকে এখন যেমন মিথ্যে করে শিখিয়েছে তেমনি ওর বন্ধুবান্ধবদেরও ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসত। ওরা হানিফার দুঃখকষ্টের কথা আমাকে বলত—বেচারী হানিফা! বড্ড কষ্টে ওর দিন যাচ্ছে অর্থাৎ ওকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে। শেষে গোটা পাঁচেক টাকা ধার চাইত। আর টাকাটা ও বাচ্চাদের কিছু কিনে দেবার জন্যে আমার কাছ থেকে ধার করত। আমি তিনটে টাকা ওকে দিই। তার থেকে ও এক আনার লেবু লজেন্স কিনে বাচ্চাদের দিত। সে সময় ৩২৫ টাকা দিয়ে আমি একটা সাইকেল কিনেছিলাম। এটা ও কেমন করে যেন জানতে পেরেছিল। একদিন ও ওর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমার কাছে এল। সবসুদ্ধু ওরা চারজন। তিনজন সাইকেলে এসেছে। এসেই ওরা আমার সামনে সত্যাগ্রহ শুরু করে দিল। অর্থাৎ হানিফার আমার ভালো সাইকেলটা চাই। আমার ভালো সাইকেলটা দেখিয়ে ও ওর ছ্যাকরা সাইকেলগুলো ভাড়ায় খাটাবে। আমি ওদের বললাম যে আমার সাইকেলের খুব দরকার। তখন ওর বন্ধুদের একজন বলল—হানিফা সাইকেলের দাম দিয়ে দিবে। ওর বলা শেষ হবার আগেই হানিফা এক গোছা নোট আমার কোলে ফেলে দিল। আমি গুণে দেখি ২৪০ টাকা। বাকী?—বাকী বাড়ি গিয়েই হানিফা পাঠিয়ে দেবে। ওর বন্ধুরা বলল যে ওরা দেখবে যে হানিফা যেন পাঠিয়ে দেয়। ওরা জামীন হয়ে থাকবে। তারপর সেই ২৪০ টাকা থেকে হানিফা তক্ষুনি দশটা টাকা আমার কাছ থেকে ধার চাইল। বাচ্চাদের তিন টাকার মতো কিছু কিনে দেবে। মাস কয়েক কেটে যাবার পরও বাকী টাকা পাঠাল না। আমি যখন বাড়ি আসতাম ওর বন্ধুরা আমাকে দেখলেই লুকিয়ে পড়ত। দে বেটা এখন সেই টাকা।

—আমি আর্মিতে চলে যাচ্ছি।

আবী বলল—আমিও আর্মিতে যাব।

লায়লা বলল—আমিও।

ঐশম্মা বলল—তা হলে আমরাই বা বাকী থাকি কেন? রশীদ আর আমিও তা হলে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যাই। গভর্ণমেণ্টকে ভাত রেঁধে দেব।

ঐশম্মা, তোমার সাহস তো কম নয়। আমাদের মাঝখানে এসে কথা বলছ? ভাইসাহেব রয়েছে নইলে তোমাকে আমি...যাও ওদিকে...বলে ও বাজারের কাছে ওর দরজির দোকানে চলে গেল।

একটু পরে রশীদ আর সুবেদাকে নিয়ে আম্মা আমার কাছে এল। আমরা গোসল করতে যাচ্ছি। বাচ্চাগুলোকে একটু দেখো।

আমি বাচ্চাদের দেখতে লাগলাম। একটু পরে বাচ্চাদুটো কাঁদতে শুরু করল। ওদের কান্না বন্ধ করতে আমি ওদের দুজনের মাঝখানে ছাগল ছানাটাকে দিয়ে এলাম।

বাচ্চা দুটো প্রস্রাব করল। ছাগলছানা মলমূত্র ত্যাগ করল। ঠিক এই সময় ফিটফাট আবু সেখানে উপস্থিত হল। এসেই জিজ্ঞেস করল, কী এসব এত নোংরামি—ছ্যাঃ।

আবু বাচ্চাদুটোর কান্না থামাল। চোখদুটো গোল গোল করে, জিভ বার করে ও বাচ্চাদুটোকে ভয় দেখাল। পাতুম্মার ছাগলটাকে মেরে তাড়াল, বেড়ালগুলোকে মারল, মুরগীগুলোর পেছনে তাড়া করল।

এর মধ্যে আমি ছাগলছানাটার মলমূত্র পরিষ্কার করলাম তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে উঠোনে রেখে এলাম।

—কী কাণ্ড! ছাগল, মুরগী, বেড়াল বাচ্চা সকলে মিলে উঠোন, বারান্দা কী নোংরাই না করেছে। ভাইসাহেব, তুমি বেশ এসবের অনুমোদন করছ।

—আমি কি করব?

—সকলকে ধরে মার লাগাবে।

আবুর চেহারাটা সরু সুতোর মতো কিন্তু মারধোর আর চেঁচামেচি করতে ওর জুড়ি নেই। সকলেই ওকে ভয় করে। ওর কাছে বাচ্চাদের রেখে যাওয়ার কথা আম্মারা ভাবতেই পারে না।

—ভাইসাহেব, আপা কি তোমায় বলেছে যে তোমার একটা মুণ্ডু আর সার্ট আমি চুরি করেছি?

আনুম্মা বলেছে কি না বলেছে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বললাম না।

ওর খুব রাগ ধরে গেল। বলল, এ বাড়িতে সকলেই ইচ্ছেমতো চুরি করছে, শুধু আমি নয়। আম্মা, আপা ওরাও একটা করে মুণ্ডু চুরি করেছে। বলেছে সে কথা?

—আনুম্মা তো বলে নি যে তুই চুরি করেছিস।

—আমি তোমার একটা সার্ট আর মুণ্ডু চুরি করেছি তা আমি খোলাখুলিই বলব। ভাইসাহেব, তুমি আমাকে কী দিয়েছ?

—তুই এখন যে খাটটায় শুস্ সেটা। ওর দাম চল্লিশ টাকা। খাটের সতরঞ্চি, বিছানা, বালিশ, চাদর সব। তা ছাড়া গায়ে ঢাকা দিস যে কাশ্মীরী শাল সেটাও, তারই দাম প্রায় পঞ্চাশ টাকা। তুই পকেটে যে পার্কার কলমটা খুব স্টাইল করে গুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিস সেটাও আমার। ওটার দাম বিয়াল্লিশ টাকা। তারপর তুই যখনই আমার কাছে এর্ণাকুলমে এসেছিস তার সব খরচ। এসবের কোনো হিসেব নেই—না?

—এসব তো পুরোনো জিনিস। নতুন কিছু দিয়েছ?

—যখন দিয়েছিলাম তখন নতুন ছিল।

—ভাইসাহেব, আমার পঁচিশটা টাকা চাই।

—কেন?

—দরকার আছে।

হানিফা টাকা চাইছে, আবুও চাইছে। কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। আবুর টাকা পয়সার বেশি দরকার নেই। ওর দশজোড়া সার্ট, মুণ্ডু আর গেঞ্জি আছে। এক বাক্স ভর্তি জুতো তাও প্রায় দশজোড়া হবে। আম্মা আমাকে বলেছে।

মেয়েরা সব গোসল করে ফিরলে পর ছেলেরা খেতে এল। আবদুল কাদের এসেই বলল—ভাইসাহেব, আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই খুব দরকার।

—বাজে বকিস নি।

হানিফা আর একবার আমাকে মনে করিয়ে দিল—আমি দশটা টাকা চেয়েছি কিন্তু।

আমি কিছু বললাম না। ঘণ্টাখানেক পরে সব ব্যাপার বুঝতে পারলাম, পিওন কুট্টন পিল্লে গেট পেরিয়ে এসে বলল আপনার একটা একশো টাকার মানি অর্ডার আছে।

কুট্টন পিল্লের একগালে একটা আঁব। সেদিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই মানি অর্ডারের কথা তুমি আর কাউকে বলেছ?

—স্যার, আমাদের এখানে বাস করতে হয়। আবদুল কাদের, হানিফা—এদের কাছে অনেক দরকার থাকে আমার। ওরাই আমাকে বলেছিল যে আপনার মানি অর্ডার এলে আগের থেকে ওদের জানাতে।

—হুঁ। আমার টাকার দরকার নেই, কুট্টন পিল্লে, তুমিই টাকাটা নিয়ে নাও।

—সে কি কথা স্যার?

—পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ আর তিনবার করে পাঁচ কত হয়?

—একশো।

—ঐ হচ্ছে আমার একশো টাকার হিসেব।

তারপর আমি পিওনকে সব খুলে বললাম। ও বলল—তা স্যার এরকম হবে বৈকি।

এরকম হবে বৈকি! ও: কি ভীষণ ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে! কি ভীষণ জোচ্চুরী।

কুট্টন পিল্লে ওর মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছে সেই গল্প শুনতে শুনতে আমি মানিঅর্ডারে সই করলাম। একশো টাকার নোটটি আমি নিলাম। তক্ষুনি আম্মা আর আনুম্মা সত্যি এমনিই বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

আমি দশটাকার একটা নোট নিয়ে পাতুম্মার ছাগলটার দিকে এগিয়ে দিলাম।

কুট্টন পিল্লে বলল—এটা কিরকম হচ্ছে স্যার।

আমি বললাম—আহা—ও' থাক্। পাতুম্মার ছাগলের বাচ্চা হয়েছে আজ দুদিন হল।

পিওন হেসে চলে যেতেই আম্মা তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলো—কত টাকা রে?

—তোমরা জান না?

কি করা যাবে? সেদিন একশোটা টাকা উড়ে গেল।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যায় হানিফা আমাকে চা খাওয়ার পয়সা দিল। সাধারণত আবদুল কাদেরই দেয়, আজ হানিফা দিল।

হানিফাটা হাড় কিপটে। ওর দোকানে একটা লণ্ঠন পর্যন্ত নেই। কাছেই আবদুল কাদেরের টিনের দোকান। ওখানে পেট্রোম্যাক্স দশ-বারোটা আছে। গ্রামোফোন আছে (গ্রামোফোনটা আমার, আম্মাকে দিয়ে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দোকানে রেখেছে)। পেট্রোম্যাক্স, গ্রামোফোন ও ভাড়া দেয়। সন্ধ্যার সময় কাজ থাকলে হানিফা আবদুল কাদেরকে বলে—আলোটা একটু এইদিকে বাড়িয়ে দাও তো।

এমনিভাবে ধার করা আলোতে হানিফা তার কাজ চালায়। বসে বসে চা খেতে খেতে আবদুল কাদেরের কথা মনে পড়ছিল। ও সব সময় আগুনের কাছাকাছি থাকে। দোকানে ওর কামারের হাপর আছে। সবসময় ও কাজ করছে। ওকে দেখলে অনেকে মনে করে আমার বড়ো ভাই।

ও সবসময় পিলে চমকে দেওয়া কাজ করে। আমরা একসঙ্গে মালয়ালম ক্লাস ফোর অবধি পড়েছি। তারপর আমি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হই। আবদুল কাদের মালয়ালম ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা পাস করার সময় আমি ক্যানানোর জেলে ন'মাসের কঠিন পরিশ্রমের সাজা পাচ্ছি। এ বিষয়ে 'আমার স্মৃতি' বইটিতে আমি সব লিখেছি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে এলে পর দেখি আমার সব সম্পত্তি ধারে দেনায় ডুবে রয়েছে। বাড়িতে পেট পুরে খাওয়া নেই। আবদুল কাদের তখন আমাদের সেই নারায়ণ পিল্লা মাস্টারমশাইয়ের স্কুলের এক শিক্ষক। আমি একটা কাগজ বের করবার জন্যে কোচিনে এলাম। কিছুকাল পরে আমি দেশে ফিরে দেখি আবদুল কাদের শিক্ষকের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিড়ির দোকানে কাজ নিয়েছে।

কুলোয় পাতা, তামাক আর কাঁচি নিয়ে ও বিড়ি তৈরি করছে। দিনে আড়াই হাজার বিড়ি ও বাঁধে, এক টাকা বা দেড় টাকা মজুরি।

তারপর আমি বাড়ি আসার পর বিড়ি বাঁধার কাজ ও ছেড়ে দিল। বাজারের কাছে একটা ছোটো ঘর নিয়ে কামারের হাপর নিয়ে টিনের কাজ করতে শুরু করল।

টিন দিয়ে ও অনেক কিছুই তৈরি করত। এসব কেউ ওকে শেখায় নি। নিজের বুদ্ধি ও নিজের চেষ্টায় ও সব শিখেছে।

তখন ১৯৩৬ কি '৩৭ সাল হবে। আমি তখন একজন নামকরা লেখক। এর্ণাকুলমে থাকি; খুব লিখে যাচ্ছি। লেখা থেকে সাশ্রয় কিছু হচ্ছে না তবু লিখে যাচ্ছি। মাসিক পত্রিকায় লেখা সব ছাপা হচ্ছে। কাগজে ছাপার পর সেগুলো আবার আমি ছিঁড়ে ভালো করে গুছিয়ে আমার ফাইলে রেখে দিই। এমনিভাবে আমি আমার সাহিত্যজীবন যাপন করছি এই সময় একদিন আবদুল কাদের ওর ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে পকেটে একটা ফাউন্টেন পেন গুঁজে আমার কাছে এল।

—দেখি এসব কাগজে তোমার লেখা সব কী ছেপেছে।

আমি খুব খুশি হয়ে আমার সব সাহিত্যসৃষ্টি ওর হাতে তুলে দিলাম। তারপর ওর কাছ থেকে দু আনা চেয়ে নিয়ে চা খেতে গেলাম। চা খেয়ে আমি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরলাম। আবুদল কাদের আমার লেখা পড়ছে—পড়ুক। পড়ে খানিকটা আনন্দ পাক। ওর কাছ থেকে আরো চার আনা ধার করতে হবে। এইসব মহান সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা আমি—ওর বড়ো ভাই। আমি চাইলে ও দেবে। এইসব ভেবে আমি ঘরে ফিরলাম। এসে দেখি আমার লেখাগুলোতে ও ওর মোটা কলম দিয়ে অনেক জায়গায় দাগ দিয়েছে। কিসের দাগ সব? আমি একটা বিড়ি ধরিয়ে চেয়ারে বসার পর ও ডাকল, ভাইসাহেব, এদিকে একবার এসো।

খুব দরকারী কিছু কাজ নিশ্চয়ই। আমি উঠে ওর কাছে মাদুরে বসলাম। ও খুব অবজ্ঞাভরে আমাকে একবার দেখল। তারপর আমার লেখা থেকে এক লাইন পড়ল। খুব স্টাইলের লেখা কিন্তু ও জিজ্ঞেস করলো—এতে সেই ব্যাকরণের আখ্যাদং কোথায়?

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী আখ্যাদং কিসের আখ্যাদং?

আমি যেন একটা স্কুলের ছাত্র, এমনিভাবে ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করল। তাতে আখ্যা, আখ্যাদং, অব্যয়, প্রত্যয়, লট, ইত্যাদি ব্যাকরণের চর্চা।

আধঘণ্টা ও আমার সঙ্গে আলোচনা করল তারপর আমাকে একেবারে বুদ্ধু ধরে নিয়ে বলল—তোমার ব্যাকরণ পড়ে লেখা শুরু করা উচিত।

শুধু তাই নয়, কতকগুলো ব্যাকরণ বইয়ের নামও বলল, আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল, বললাম—যা যা, উঠে পড়। তোর আখ্যার নিকুচি করেছে। তুই না চিনি আর ঘি চুরি করে খেয়ে তোর অসুখ করেছে বলে মিথ্যে কথা বলে ঘুরে বেড়াতিস। শোন্, এসব আমি যেমন কথাবার্তা বলি সেইভাবে লিখেছি। তোর লট্, অব্যয়, আখ্যাদং না থাকলে কি হয়—অ্যাঁ? দূর হ ল্যাংড়া।

ও বলল—তুমি আমাকে যত গালাগালি দিতে ইচ্ছে হয় দাও। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। শুধু একটা কথা, আমি যে বইগুলোর নাম করলাম সেগুলো পড়ে তারপর তোমার লেখা শুরু করো।

—যা, যা, নিজের চরকায় তেল দে। আর শোন্, বাড়ির সকলের কথা আমি জিজ্ঞেস করেছি বলিস—বিশেষ করে-আম্মা আর আব্বার কথা। আমার হাতে এখনো পয়সা আসতে শুরু করে নি তাই আমি বাড়িতে কিছু পাঠাতে পারছি না। বলিস হাতে এলেই পাঠাব।

আমি ওর কাছ থেকে এক পয়সাও আর ধার চাইলাম না। ধার চাইবার মন ছিল না। বেটার ব্যাকরণের নিকুচি করেছে। আমার লেখার ভুল ধরতে আসে।

সেসব দিন অবশ্য চলে গেছে। এখন আমার সব বই ও খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে। আমাদের আত্মীয়স্বজন নিয়ে কিছু গল্প লেখার জন্যেও ও আমায় অনুরোধ করে।

—তুমি লিখে আমায় দিলেই হবে, আমি ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করব।

অর্থাৎ আমি লিখব আর ও পয়সা লুটবে। কি বদমাইশ!

পরের দিন আমার জামরুল গাছটার দিকে তাকিয়ে মুখ ভর্তি জল নিয়ে হ্যাংলা মেয়েগুলো যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তখন পাতুম্মা এসে ওর ছাগল আর ছানাটাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল।

এখানে ওদের কেউ দেখবে না ভাইসাহেব। আর আবু তো সব সময় এদের 'দূরছাই' করছে। আর তা ছাড়া...কাল থেকে দুধ বিক্রি করতে হবে। একটা চায়ের দোঁকানে দুধ দেব বলে কথা দেওয়া হয়ে গেছে।

ওঃ এইই হচ্ছে আসল কারণ।

পাতুম্মা ছাগলটা আর ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল। তারপর ছাগল আর তার বাচ্চাটা আসত রোজ সকাল দশটার সময়। ছানাটা খুব চটপটে। তিড়িং তিড়িং করে লাফ মেরে ঘুরে বেড়ায়—দেখতে বেশ লাগে। আমার বিছানাতেও ওঠে, বাচ্চাদের সঙ্গে খায়। ওর আম্মা ছাগলটাও খুব হ্যাংলা হয়ে গেছে সেও বাচ্চাদের সঙ্গে ভাত খায় তার সঙ্গে চীৎকার, গণ্ডগোল আর ছুটোছুটি।

এমনিভাবে কিছুদিন কাটার পর একদিন দেখি বাড়িতে খুব হাসি হট্টগোলের ধূম পড়ে গেছে। আবী, পাতুকুট্টি, সেয়দু মহম্মদ, লায়লা, আরিফা সকলেই এখন চায়ের সঙ্গে দুধ পাচ্ছে। তার জন্যে এত হাসি হৈ হৈ কেন? আমি দেখতে গেলাম। কুঞ্জানুম্মা, আনুম্মা, আম্মা, ঐশম্মা সকলে টোপিওকা সেদ্ধর সঙ্গে দুধ চা খাচ্ছে আর হাসছে।

—কি ব্যাপার আম্মা—এত হাসিহল্লোড় যে?

—কিছু না রে! আম্মা হেসে বলল।

—ভাইসাহেব, তুমি কিন্তু বোলো না। আমরা ছাগলছানাটাকে বেঁধে

রেখেছি।—আনুম্মা বলল—তারপর?

—তুমি বলে দেবে?

—কি ব্যাপারটা শুনিই না।

আবদুল কাদেরের বউ বলল—আমরা পাতুম্মার ছাগলটাকে দুইয়েছি। এক পো দুধ পেয়েছি।

—আম্মা এসব কি? তোমরা কেন পাতুম্মার ছাগলের দুধ চুরি করছ?

আম্মা বলল—ওর কি আমাদের কথা একটুও মনে রাখা উচিত ছিল না?

—ভাইসাহেব, আপাকে কিছু বোলো না, বললে খুব বিপদে পড়ব।

হোক বিপদ। আমার চোখের সামনে আমি তা বলে এই চুরি হতে দিতে পারি না। পাতুম্মা এলে বললাম—পাতুম্মা সাবধান। তোর ছাগলটার দুধ দুয়ে এরা সব চা খেয়েছে। ছানাটাকে তারপর বেঁধে রেখেছে।

পাতুম্মা হৈ হৈ শুরু করে দিল—ওদের লজ্জাশরম কিছু নেই। ওদের বাচ্চাদের ওরা এমনি ভাবে বেঁধে রাখতে পারবে? একবার দেখি আমি জিজ্ঞেস করে?

পাতুম্মা রান্নাঘরের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তখন সেখানে আম্মা, আনুম্মা, ঐশম্মা, পাতুকুট্টি, আবী, লায়লা, আরিফা সকলেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা কোরাসের মতো একসঙ্গে বলল—দুধ আমরা দুয়েছি, আবার দুইব। ছাগলটা আর তার বাচ্চাটা এখানেই বড়ো হয়েছে। আমাদের টোপিওকা, ভাতের ফেন, তরকারীর খোসা, আমাদের ঘাস, কাঁঠাল পাতা, ভাত খেয়ে ছাগলটা আর বাচ্চাটা মানুষ হয়েছে। আমরা যদি একটু দুধ নিইই হয়েছে কী তাতে!

পাতুম্মা তখন ওদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। বলল—আনুম্মা, তুই আমার ছোটো বোন। তোকে আমি একটা ছাগল পর্যন্ত দিয়েছি আর তুই আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করলি? আম্মা তুমি আমার আম্মা, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে তুমি এই ছোটোদের দলে ভিড়েছ?

আম্মা বলল—হয়েছে হয়েছে—চুপ কর্। তোর আম্মা, তোর ছোটো বোন তোর ভাবী সকলে মিলে দুধ দুয়েছে। সেই দুধ দিয়ে সকলে চা খেয়েছি আমরা। বেশ সোয়াদ দুধের।

পাতুম্মা বলল—আমি আর এ বাড়িতে পা দিচ্ছি না।

পাতুম্মা ছাগলছানাটাকে কোলে নিয়ে চুমু খেল।

—আহা বাছা রে। তোর দুধ ওরা সব চুরি করে খেয়েছে। কী করি—তোকে শুধু পানিই খাওয়াই—আয়।

পাতুম্মা ছাগলছানা নিয়ে আমার কাছে এল।

—আমি যাচ্ছি ভাইসাহেব। দেখি এবার এরা কী করে আমার ছাগলের দুধ দুয়ে খায়।

পাতুম্মা ছাগলছানাটাকে নিয়ে গেল। আমি খুব খুশি হলাম। বাচ্চাটা নেই এখন এরা কী করে দুধ দোয় দেখি। ভারি অসভ্য সব।

ছয়

ঠিক দশটার সময় পাতুম্মার ছাগলটা আসে। তার একটু পরে পাতুম্মা আর খাদিজা। পাতুম্মার রাগ হয়েছে কিনা কে জানে তবে ছোটো বোন, আম্মা, ভাবী, ভাইয়ের বউ সকলের সঙ্গে তো গল্পগুজব করে। বাড়ির কাজও করে। টোপিওকা খায়। বিনা দুধে চা খায়। ছাগলটাকে ফেনও দেওয়া হয়।

কোচ্চুন্নী এলে পর আমি দুধ চুরির কথা বললাম। কোচ্চুন্নী বলল—আমি তো তাই বললাম একটু দুধ দিতে। কিন্তু পাতুম্মা কি করেছে জানো? চারটে বাড়িতে দুধ জোগান দেবে বলে কথা দিয়েছে। একটা চায়ের দোকানে দুধ দেব বলে আমি কথা দিয়েছি। আমাকে, খাদিজাকেও চায়ের জন্যে একটু দুধ দেয় না।

ও হো, এই ব্যাপার। তা হলে কোচ্চুন্নী আর খাদিজাও পারলে দুধ চুরি করে খায়। আমি পাতুম্মাকে বললাম—তুই কি রে! কোচ্চুন্নী আর খাদিজাকেও একটু দুধ দিস না?

পাতুম্মা বলল—দুধ বিক্রির টাকা খাদিজার আব্বাই তো নিচ্ছে। আর তা ছাড়া এতদিন তো প্রত্যেকেই দুধ ছাড়া চা খাচ্ছিল, এখন এত লোভই বা কেন? আমি কি চায়ে দুধ খাচ্ছি নাকি?

—তুই বড়ো কৃপণ হয়ে গেছিস দেখছি।

তবু পাতুম্মাকে দোষ দিয়েই বা কি করব। বসে বসে নানা কথা ভাবছি এই সময় আনুম্মার বর সুলেমান তিনটে আনারস নিয়ে এসে বলল—

খুব মিষ্টি আনারস। খেয়ে দেখো ভাইসাহেব।

আমি একটা কেটে বাচ্চাদের এক খণ্ড করে দিয়ে নিজে খাচ্ছি এমন সময় আবু সেখানে এল।

—বাঃ বাঃ, বড়োলোক হলে এমনি করে আরাম চেয়ারে বসে আনারস খাওয়া যায়। কই আমাকে তো কেউ এক টুকরো আনারস দেয় না! হ্যাঁ ভাইসাহেব, আজ আবার তোমাকে একটা বড়ো ভোজ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—কী ভোজ?

—পরোটা, লিভার ভাজা আর চা।

—তুইও আমার সঙ্গে আয়।

—আমাকে কেউ নেমন্তন্ন করে নি। ভাইসাহেব, একটা ব্যাপার শুনেছ? ঐ

হাড়কিপ্‌টে বড়ো আপা হানিফা ভাইসাহেব আর ছোটো ভাইসাহেবকে কাল দুধ দিয়ে চা তৈরি করে পাঠিয়েছে।

—দুধ দিয়ে চা?

—হ্যাঁ।

—তোকে দেয় নি?

—আমি ওদের নাকের কাছেই বসে আছি তো। তাই আমারও একটা সিঙ্গল্ জুটেছে।

আশ্চর্য! পাতুম্মা আবদুল কাদের আর হানিফাকে আর সেইসঙ্গে আবুকেও দুধ দিয়ে চা করে পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে।

—কি ব্যাপার? পাতুম্মা যে তোদের দুধ চা পাঠাল?

—হানিফা ভাইসাহেব স্ট্রাইক করেছিল।

—কিসের স্ট্রাইক?

—আপার আর খাদিজার সব ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করে দেয় হানিফা ভাইসাহেব। পরশু না কবে কাপড় নিয়ে খাদিজা এলে পর 'সেলাই করতে পারব না'—বলে হানিফা ভাইসাহেব খাদিজাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে আর তাড়িয়ে না দেয় তাই ঘুষ হিসেবে সিঙ্গল্ দুধ চা পাঠিয়েছে।

—আর আবদুল কাদেরকে যে দিল?

ছোটো ভাইসাহেবের কাছে দুলহান ভাই বেশ কিছু টাকা পায়। আপাকে ছোটো ভাইসাহেব সে কথা বলেছে। টাকা তাড়াতাড়ি ফেরত না দিলে কেস ঠুকে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। প্রথম প্রতিবাদী দুল্‌হান ভাই, দ্বিতীয় প্রতিবাদী আপা আর তৃতীয় প্রতিবাদী খাদিজা। এতেও যদি না হয় তা হলে ছাগলটাকে পর্যন্ত ক্রোক করা হবে। এইসব বন্ধ করার জন্যে আরো এক কাপ সিঙ্গল্ দুধ চা।

এমনিভাবে পাতুম্মার ছাগলের দুধ নিয়ে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ আবু বলল—কুট্টন পিল্লা আসছে।

সত্যিই তো পিওনটা আসছে। পিওন আমার হাতে একটা পার্সেল দিল। পিওন চলে যাবার পরও আমি পার্সেলটা খুলে দেখি নি এমন সময় আম্মা এল।

—বাণ্ডিলটায় কী রে?

—আমার নতুন বইয়ের দশ কপি। আমার প্রকাশকেরা আমাকে পাঠিয়েছে—আর কিছু জানতে চাও?

হ্যাঁ, আম্মার আরো কিছু জানার আছে।

—বইগুলো বিক্রি করলে পয়সা পাওয়া যাবে?

—তুমি যাবে এখান থেকে। পয়সা, পয়সা আর পয়সা। উঃ, আমার মাথার পোকা খেয়ে ফেললে তুমি।

আমার কাছে তখন একটা পয়সা পর্যন্ত ছিল না। আম্মা চলে গেলে পর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি আবুকে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম—এই বইগুলো তুই বাজারে বিক্রি করে আনতে পারিস?

ও সোজা জিজ্ঞেস করল—কত কমিশন দেবে?

—দেব, দেব, কমিশন দেব—বলে পার্সেলটা খুলে নয়টা বই একটা কাগজে মুড়ে ওর হাতে দিলাম। ও চলে গেলে পর চুপচাপ ভাবতে লাগলাম—নিজের গাঁ এখানে আমার লেখা বই কি কেউ পয়সা দিয়ে কিনে পড়বে?

ঘণ্টা দুই তিন কাটল। আবু এল। খুব ভাগ্য আমার, বইগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে, একটা বইয়ের সব দাম আবুকে আমি কমিশন হিসেবে দিলাম। বাকী টাকাটা গুণে দেখছি এমন সময় 'কত পেলি রে?'—বলে আম্মা এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। আম্মা এই টাকাটা দেখতে পেয়েছে দেখে আমার ভীষণ রাগ ধরল। আমি রাগেব চোটে হাতের কাছের গেলাসটা নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলাম। গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আম্মা একটা কথাও না বলে কাঁচের টুকরোগুলো একটা একটা করে কুড়িয়ে কাগজে মুড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। তারপর ঠিক আমার সামনে বসে একটাও কথা না বলে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমি আমার বইয়ের বাকী কপিটা (বইয়ের নাম 'বিশ্ববিখ্যাত নাসিকা') নিয়ে পাতুম্মার ছাগলের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ছাগলটা বইটা খাওয়ার জন্যে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল।

—একি হচ্ছে ভাইসাহেব?—আবু জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, পাতুম্মার ছাগল 'বাল্যবন্ধু' আর 'শব্দ' এই বই দুটো বেশ মজা করে খেয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম আরো বই আছে খেতে দেব। 'বিশ্ববিখ্যাত নাসিকা' ও খেয়েই দেখুক না।

—নাঃ নাঃ ছাগলটাকে খাইয়ো না। মাথা খারাপ নাকি তোমার—অ্যাঁ?

আমি বইটা বাক্সের মধ্যে তুলে রাখলাম। আবু যাওয়ার পর বই বিক্রির অর্ধেক টাকা আমি আম্মার কোলে ফেলে দিলাম।

আম্মা জিজ্ঞেস করল—এক-একটা বইয়ের কত দাম ছিল।

আমি সত্যি কথা বললাম। একটু পরে আবদুল কাদের খেতে এলে পর আমার কাছে যে বাকী বইটা ছিল সেটা চেয়ে নিল।

—একটা বড়ো বাণ্ডিল দেখলাম যে?

দশ কপি ছিল। নটা আবুকে দিয়ে বিক্রি করিয়েছি।

—টাকাটা কোথায়?

—একটা বইয়ের দাম আবুকে দিয়েছি। বাকী টাকার অর্ধেক আম্মাকে দিয়েছি।

—তুই বইটা বিক্রি করে পয়সা নে।

—'আম্মা' বলে ও ভেতরে গেল। খানিকটা গোলমালের শব্দ শুনতে পেলাম।

—আমিই এখানকার খরচপত্তর সব করছি, তোমরা নয়—আবদুল কাদের বলছে শুনতে পেলাম।

কিছুক্ষণ পরে ও খুশি মনে চলে গেল। আম্মার মুখ দেখে বুঝলাম যে আম্মার হাতের সব টাকাটা আবদুল কাদের বাগিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

চারটের সময় কোচ্চুন্নী আর খাদিজা আমায় নিমন্ত্রণ করতে এল। আমি আবুকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গেলাম।

কোচ্চুন্নীর বাড়িতে ওর আম্মা, আব্বা আর ছোটো বোন থাকে। পাতুম্মা, কোচ্চুন্নী, খাদিজা, পাতুম্মার ছাগল আর তার ছানাটা সকলের একটু শান্তিতে বাস করার জন্য আলাদা একটা বাড়ি আছে। বাড়ি মানে কুঁড়েঘর।

—আপা আমাকে বলেছে যে এই বাড়ির কথা ভাইসাহেব যেন জানতে না পারে। আমার কিন্তু মনে হয় ভাইসাহেব তোমার একবার ঐ বাড়িটা দেখা উচিত।—আবু একটা রহস্যভরা স্বরে বলল।

পরোটা আর লিভার ভাজা আমরা পেটভরে খেলাম। দুধ দেওয়া চাও খেলাম, পাতুম্মার বাড়িও দেখলাম।

—ভাইসাহেব, তুমি এখানে এলে কেন? দুঃখিত স্বরে পাতুম্মা বলল।

বেচারী পাতুম্মা! কী দুর্দশা ওর বাড়ির! মাটি খুঁড়ে তালপাতার ছাউনি দেওয়া একটা ছোট্ট ঘর। তার দরজা একটা পুরোনো বাড়ি থেকে খুলে লাগানো হয়েছে, সেটাও আবার দড়ি দিয়ে বাঁধা। দরজা বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

—ছিঃ ছিঃ তুমি আমায় এই অবস্থায় দেখলে। সত্যি আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—বেশি বাজে বকিস নি। নতুন দরজা বসানোর পয়সা আমি দেব।

—না, না ভাইসাহেব, দরকার নেই, আমি আমার ছাগলের দুধ বিক্রি করে নতুন দরজা তৈরি করব।

—না, পয়সা আমিই দেব।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর বাড়িতে বারান্দায় বসেছিলাম। কোচ্চুন্নী, সুলেমান, পাতুম্মা সকলেই আছে।

আবদুল কাদের হানিফাকে বলল—এই আমাদের কিন্তু সকালবেলায়ই যেতে হবে, কাছারী খুললেই আমরা আমাদের কেস ফাইল করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিসের কেস?

—একটা সিভিল কেস। সব কিছু ক্রোক করে নেওয়া হবে। আমি এ কেসটা

অনেকদিন ফেলে রেখেছিলাম, এখন এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যে আর ফেলে রাখা যায় না।

—কী ঘটনা?

—গরম গরম পরোটা ভেজে থালায় করে ভরে দেওয়ার সময় আমাদের কথা কারুর মনে ছিল না। লিভার ভেজে গরম গরম বাটি ভর্তি করে দেওয়ার সময় আমাদের কথা কারুর মনে ছিল না।

আমাদের জন্যে শুধু এক কাপ চা, অন্যদের গরম গরম পরোটা আর লিভার।

আনুম্মা বলল—আমি, আম্মা, ভাবীরা বিনা দুধে চা খেয়ে এ বাড়িতে বসেছিলাম, আমাদের কথাও মনে পড়ে নি।

সুলেমান বলল—আর আমি?

আবদুল কাদের বলল—সুলেমান, তুই আমাদের প্রথম সাক্ষী।

পাতুম্মা বলল, আমি কাকে কাকে ভয় করে চলব? আম্মাকে, ভাবীদের, আমার ছোটো বোনকে, ছোটো ভাইসাহেব, হানিফাকে, আবুকে, আমার কর্তাকে। এখন দেখছি সুলেমানকেও ভয় করতে হবে।

আবু চেঁচাল—থাক্ থাক্ কাউকেই ভয় করতে হবে না।

আমি আবুকে ধমক দিলাম। পাতুম্মা বলল—ছোটো ভাইসাহেব, আমি তোমাদের সক্কলকে গরম পরোটা আর লিভার ভেজে খাওয়াব, দুধে ভর্তি চাও দেব। কদিন আমাকে একটু সময় দাও।

—কত দিন?

—বলছি কত দিন। কিন্তু হানিফা, তুই কি রকম ব্যবহার করলি বল তো? খাদিজার হাতে পাঠানো জামাকাপড়গুলো তুই সেলাই না করেই ফেরত দিলি?

হানিফা বলল—আমি কি জকাত দেবার জন্যে দর্জির দোকান খুলেছি নাকি? রোজ আবুর সার্ট সেলাই করতে হবে। এ বাড়ির সকলের জামা সেলাই করতে হবে; কেউ এক পয়সা দিয়েছ কোনোদিন?

আবদুল কাদের বলল—তোর বউয়ের ব্লাউজ সেলাই করার পয়সা আমি দেব, লায়লার ফ্রক সেলাই করার পয়সাও আমি দেব? আবীর হাফ প্যান্ট আর সার্ট সেলাইয়ের দামও আমি দেব। বা—বেশ মজা তো।

হানিফা রেগে গেল।

—কারুরই আমাকে কিছু দিতে হবে না। আমি আর্মিতে চলে যাব, আজই—এই রাতেই।

তখন আমার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমি ওকে বললাম—দাঁড়া দাঁড়া, আর আধঘণ্টা পরেই নাহয় আর্মিতে ভর্তি হস। তুই আর্মিতে থাকার সময় কয়েকবার ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে ফিরে যাওয়ার সময় এর্ণাকুলমে আমার কাছে এসে

থাকতিস, মনে আছে? তখন তুই আমার কাছ থেকে প্রায়ই পাঁচ-দশ টাকা ধার করতিস। তোর হাতে যা ছিল তা সব আম্মা আর আবদুল কাদের চেয়ে নিয়েছে বলে তুই আমার কাছে টাকা ধার করতিস—মনে আছে? সে টাকা তুই আমাকে ফেরত দিস নি। যাবার আগে দিয়ে যা সেসব টাকা।

হানিফা সঙ্গে সঙ্গে ঐশম্মাকে ডাকল—ঐশম্মা, বাচ্চাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। আমি এক মুহূর্ত আর এ বাড়িতে থাকতে চাই না। সত্যি, এদের উৎপাতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেলাম। চলো কোথাও গিয়ে দুটো তালপাতা খাড়া করে থাকব। এসো। আবী আয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমার পয়সাটা ফেরত না দিয়েই চলে যাচ্ছিস যে বড়ো।

ও বলল—সে তো তখনকার কথা ভাইসাহেব। এখন ও সব মনে রেখেছে কে?

—যাক্ আমি যে দিয়েছি তার প্রমাণ হল। তাইই যথেষ্ট।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর চারটের সময় পাতুম্মা, কোচ্চুন্নী খাদিজার গলার স্বর পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। আমি শুয়েই রইলাম। আম্মা জিজ্ঞেস করল—তুই কি উঠেছিস নাকি?

—না। কেন?

আম্মা বলল—তোর হাতে পয়সা থাকলে আমাকে একটা টাকা দে। কেউ যেন জানতে না পারে।

—টাকা তো আমি তোমাকে কালই দিলাম।

—সে টাকা আবদুল কাদের চেয়ে নিল। ওই তো সংসারের দেখাশুনো করছে। সংসারের যে কত খরচ তা তো আর বুঝিস না। রোজ কত টাকা লাগে তা তুই একবার ভেবে দেখিস দিকিনি।

—যাও, তোমার কাজে যাও। বেশি কথা বললে আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব।

আম্মা আর একটাও কথা বলল না। আমি শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে বেশ কয়েক বছর আগেকার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল।

তখন আমি আমার ঐ ছোটো বাড়িটায় থাকতাম। আমি একদিন বেশ ভালো একটা ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি এলাম। গাড়ি বাড়ির সামনে থামলে পর অনেক লোক এসে জড়ো হল। আমি ড্রাইভারকে নোট গুনে দিচ্ছি তা সকলে দেখল।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে যাচ্ছি তখন আম্মা, আবদুল কাদের আর হানিফা এল। এসেই আবদুল কাদের বলল—ভাইসাহেব, তোমার হাতে টাকা থাকলে কাছে রেখো না। আমার হাতে দাও। চুরি ডাকাতি হতে পারে। তোমায় মেরেধরে টাকা নিয়ে যেতে পারে।

আমি আম্মার চোখের সামনে গুনে পাঁচশো টাকা ওর হাতে দিলাম। চোরের হাতে মারধর ও-ই খাক। পয়সা তো আর উড়ে যাবে না; সকলেই খুব খুশি হল। আমি বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে একটা বিড়ি ধরালাম।

তখন কে যেন বাড়ির মধ্যে বসে আছে বলে আমার মনে হল। আমি একটুও ভয় না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে ওখানে?

—আমি রে আমি, সকলকে লুকিয়ে আমি আবার এসেছি, আম্মা বলল।

—কি ব্যাপার?

—শোন, কেউ যেন জানতে না পারে, তুই আমাকে গোটা পঁচিশেক টাকা দে।

হাজার হোক, আম্মা। আমি তক্ষুনি আম্মাকে পঁচিশটা টাকা দিলাম। তারপর নিশ্চিন্তমনে ঘুমোতে লাগলাম। পরের দিন আরম্ভ হল লোকের ধার চাওয়া। বেশির ভাগই স্ত্রীলোক। সকলেই যে মুসলমান তা নয়। কিন্তু তা হলে কী হয়, সকলের দুধ আমি খেয়েছি।

—সে কথা এত শীগগির তুই ভুলে গেলি কি করে? অন্ততঃ দুটো টাকা দে।

আমি দুই, তিন, চার, পাঁচ করে টাকা দিতে শুরু করলাম। যখন তা প্রায় একশো টাকার কাছাকাছি এল তখন 'না, আমি কারুর দুধ খাই নি' বলে কাউকে কিছু না দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইলাম।

এর মধ্যে আবার বেশ মজা হল। আম্মা আবী আর পাতুকুট্টিকেও নিয়ে এল।

—এই বাচ্চা দুটোকে কিছু দে। তামার পয়সা তা বলে দিস নি।

শুধু তাই নয়।

—এই তুই এখন এখানে থাকতে এলি। তোর সঙ্গে দেখা করতে তোর বন্ধুবান্ধব আসবে তাদের খেতে দেবার গ্লাস, প্লেট সব কোথায়?

—কলাপাতায় দিয়ো।

—দূর তা কি হয়। আমাদের কিছু থালা, গেলাস, ঘটিবাটি কিনতে হবে।

—আমার কাছে পয়সা নেই।

—তা হলে আমি আনা পরম্বিলের দোকানে গিয়ে বলব যে তুই বলে দিয়েছিস ওখান থেকে কিনতে।

হ্যাঁ, আম্মা তা করতে পারে। মিস্টার ভার্কীর আনা পরম্বিলে বড়ো স্টেশনারী দোকান আছে। মিস্টার ভার্কী আমার খুব বন্ধু। আম্মা যদি ঐ দোকানে যায় তো সারা দোকান কিনে আনতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমি বললাম—তোমাকে যেতে হবে না। আমি কিনে নিয়ে আসব। তারপর আমি গিয়ে এক ঝুড়ি বাসন কিনে একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে বাড়ি এলাম। সব সমস্যার সমাধান হয়েছে ভেবে আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে আছি এমন সময় একদিন আম্মা বলল—তুই তো এখন এখানে থাকবি। তোর বন্ধুবান্ধব সব এলে কিসে শোবে? তুই কিছু মাদুর আর বালিশ কিনে রেখে দে।

—আম্মা, বেশি বাজে বোকো না, নিজের কাজে যাও।

কিন্তু উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি মাদুর-বালিশও কিনলাম। তখন আম্মার একটা পেতলের ঘড়া চাই। জল রাখা যাবে, আরও কত কী কাজে লাগবে।

আমি ভাবলাম—পেতলের ঘড়ার পর আসবে গরুর গাড়ি, তারপর আসবে মোটর গাড়ি, উঃ কী যন্ত্রণা!

আমি আমার বাক্স বিছানা নিয়ে বাড়ি ছাড়লাম। ভারকেলা, মাদ্রাজ এইসব জায়গা ঘুরে এলাম। আবার গেলাম, আবার এলাম। সেই থেকে এইই চলেছে। আমার ব্যাপারটা হানিফার সৈন্যে ভর্তি হবার মতো নয়। আমি যখন বলি যাব তখন যাবই। তাই আম্মা এখন আমার চলে যাওয়ার কথা শুনে চুপ করে রয়েছে। আমি উঠে বাক্স খুলে যা পয়সা ছিল তা সব আম্মার হাতে দিয়ে বললাম—ভয় নেই, আমি যাব বললেও যেতে পারব না। পথ খরচের পয়সা পর্যন্ত নেই। এখন তুমি আমাকে রেহাই দাও।

এমনিভাবে দিন কেটে যেতে লাগল। একদিন একটা খুব আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল। পাতুম্মার ছাগলটাকে আনুম্মা, কুঞ্জানুম্মা দুয়ে তার দুধ দিয়ে চা খেয়েছে। বাচ্চাটা নেই তবুও ওরা দুধ দুয়েছে শুধু একবার নয় রোজ। বাচ্চা না থাকলে আম্মা দুধ দোয় না এই বিশ্বাসে বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে আছে পাতুম্মা।

আবী আর পাতুকুট্টিকে ছাগলছানা করবার চেষ্টা বিফল হয়েছিল। শেষে সুবেদা আর রশীদ ছাগলছানা হল। এই অদ্ভুত ঘটনা পাতুম্মা শুনল। বেচারী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

—তোমরা কি মানুষ! তোমরা এরকম কি করে করতে পারলে! ঠিক আছে, আমি তোমাদের এবার থেকে দুধ দেব।

পরের দিন থেকে পাতুম্মার কাছ থেকে আধ বোতল করে দুধ আসতে লাগল।

সুবেদা, রশীদ, আরিফা, আবী, লায়লা, পাতুকুট্টি সকলেই খুব খুশি। আনুম্মা, কুঞ্জানুম্মা, ঐশম্মা, আম্মা সকলের এবার চায়ে দুধ জুটতে লাগল।

এবার ছাগলের সঙ্গে ছাগলছানাও আসতে লাগল। সঙ্গে আধ বোতল দুধ নিয়ে খাদিজা।

এমনিভাবে আমার বাড়ির লোকদের দুরকমের দুধ মিলতে লাগল, একটা চুরি করা দুধ, আর একটা পাতুম্মার দেওয়া দুধ। বেচারী পাতুম্মা!

একটা রহস্য শুধু এখনও জানতে পারি নি। দুধ দোয়ার এই বুদ্ধি মেয়েদের মাথায় কার আগে এল।

□

বাল্যসখী

ভূমিকা

বাল্যসখী জীবন থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা পাতা। যেখান থেকে এ পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে এখনও রক্তের দাগ জমে রয়েছে। কোনো কোন পাঠকের হয়তো এই রক্ত দেখলে ভয় লাগে, হয়তো কেমন একটা ঘৃণা জাগে; এমন পাঠকদের কিন্তু এই বই পড়ার সময় একটু সতর্ক হয়ে পড়তে হবে। আবার একদল পাঠক আছে যারা উপন্যাসে দেখতে চায় শুধু নায়ক-নায়িকার মিলন। নায়ক-নায়িকা সব রকম বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বিবাহের মিলনগ্রন্থিতে বাঁধা পড়বে এ যারা চায় তারা এ বই পড়ে হতাশ হবে। কিন্তু কি করা যাবে? তাদের ইচ্ছেমতো তো আর জীবন চলবে না। আরও একদলকে একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত। একটু কোনো বিপদ হলেই নায়ক-নায়িকার ডুবে মরা বা দুজনে মিলে একসঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা দেখে যারা খুশি হয়ে বলে ওঠে 'বাঃ কি চমৎকার বই' তাদের আশা কিন্তু এই উপন্যাস পড়ে পূর্ণ হবে না। জীবন যে মৃত্যুর চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ তা তারা এই বই পড়ে জানতে পারবে।

এই লেখকের মানসিক অবস্থা এত বিষাদে ভরা কেন? বাস্তব জীবনে তো কাঁদার অনেক সুযোগ মেলে তবে কেন কল্পনার জগতে এমনিভাবে বিষন্নতার ধোঁয়া ছড়ানো? তবে কি এই পৃথিবী এতই দুঃখে ভরা? হাসি কি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে? মানুষের হৃদয়ে আনন্দ বলে কি তা হলে কিছুই নেই? এই উপন্যাস পড়ে এই ধরনের সন্দেহ জাগলেও এই ধরনের প্রশ্ন উঠলেও বাস্তবিক এসব প্রশ্ন অসংগত। লেখকের রূঢ় কঠিন অভিজ্ঞতা এবং তার ফলে তাঁর কলম থেকে যে বেদনাময় সৃষ্টি আমরা পাই তা পড়ে আমরা দুঃখিত হতে পারি, তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে পারি কিন্তু তাঁর লেখায় বিচলিত হয়ে তাঁকে দোষ দেওয়াটা ঠিক নয়, এটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব। গল্পের বিষয়বস্তু ট্রাজেডি বা কমেডি যাই হোক না কেন তাতে কলাশিল্পের শাশ্বত সত্য প্রকাশ পেয়েছে কিনা, তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তাই দেখাই সহৃদয় পাঠকের কর্তব্য।

বাল্যসখী একটা বড়ো 'ছোটোগল্প' না ছোটো 'উপন্যাস'? এই পুস্তকে ব্যবহৃত পরিমিত উপকরণ, করুণ রসকে অন্য রসের দ্বারা পুষ্ট করে তাকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা, বাক্যের ধ্বনি প্রাধান্য ইত্যাদি ছোটোগল্পের সব গুণগুলি দেখলে একে ছোটোগল্প বলে মনে হওয়াটা অসম্ভব নয়। কিন্তু শৈশব থেকে যৌবনে

উত্তীর্ণ নায়ক-নায়িকা তাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা ও তার পূর্ণতা যা উপন্যাসে দেখা যায় তা এই গল্পে দেখা যায়। জীবনের অসহায় উত্থানপতনের কাহিনী এর প্রতিপাদ্য বস্তু, ঝকঝকে পেতলের বাক্স থেকে রুপোর পানের ডিবে বের করে তার থেকে তামাক পাতা নিয়ে হাতের তেলোয় গুঁড়ো করে মাড়িতে গুঁজে থুথু ফেলে যে আব্বা একদিন পান খাওয়ার আস্বাদ গ্রহণ করেছিল সে একদিন শুকনো পানে চুন ঘষে কারুর কাছ থেকে এক ছিলতে তামাক পাতা চেয়ে আনতে আম্মাকে পাঠায়। ভাগ্যের কি পরিহাস! আকাশছোঁয়া অট্টালিকায় শাহজাদীর সঙ্গে বাস করবার দিবাস্বপ্ন দেখার নায়ক বাস্তবজীবনে রাত এগারোটা অবধি হোটেলের এঁটো বাসন পরিষ্কার করছে। নবযৌবনের প্রারম্ভে সুহ্‌রার যে অপূর্ব সৌন্দর্য নায়ক আর পাঠকদের মধ্যে পুলক জাগিয়ে তুলেছিল সেই সুহ্‌রা রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ, ক্ষয়ে যাওয়া নখ আর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা কোনো এক ভাগ্যনিয়ন্তার খেলা বলে মনে হয়। জীবন বড়ো আশ্চর্য, তার উত্থান আর পতন যে কি ভাবে হয় তা কে বলতে পারে?

ছোটোগল্পে চরিত্র চিত্রণ খুব গভীর হয় না। একটুখানি এঁকে লেখক অনেকখানিই অব্যক্ত রেখে দেন। কিন্তু এই গল্পের প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা আমাদের মনকে স্পর্শ করে। পঞ্চু মেনন, এডাত্তীল আচ্চেনের অথবা শউকু আসানের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করছে নায়কের আব্বা। মাতৃহৃদয়ের প্রতিমূর্তি নায়কের আম্মা—নারীর আর একটি নাম সুহ্‌রা। একটা উচ্চ আদর্শ, জীবন সম্বন্ধে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম জ্ঞান এই গল্পের সর্বত্র ছড়িয়ে। চান্দু মেননের 'শারদা'র পর এতখানি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস আমাদের ভাষায় নেই বলেই আমার ধারণা।

বশীরের লেখার গুণ কী জিজ্ঞেস করলে আমি বলব জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর দৃষ্টি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রাণচাঞ্চল্য। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয়স্পন্দন আর আবেগ তাঁর শিল্পগুণকে অনেক জায়গায় ব্যাহত করেছে কিন্তু 'বাল্যসখী'তে একজন প্রকৃত শিল্পীর যে সংযম দরকার তা তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নি।

এই গল্পে মুসলমান সমাজের আমরা একটা সুন্দর ছবি পাই। এর লেখক একজন মুসলমান, যারা বলে তারা এই গল্প এবং গল্প লেখককে পূর্ণ মর্যাদা দেয় না। মুসলমান সমাজের এবং মুসলমান লেখকের বলে নয়, এই গল্পটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার নিজস্ব শিল্পিক আবেদনে। তবে একটা কথা বলা যায় যে লেখক একটি মহৎ সৃষ্টি করা ছাড়াও আর একটি খুব বড়ো কাজ করেছেন—তা হচ্ছে সমাজ সেবা। একটা সমাজের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করার একটা পথ সাহিত্য। কিন্তু কেরালার একটা বৃহৎ জনসমষ্টি—কেরালার মুসলমান সমাজ—এতদিন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে অপরিচিত ছিল। এর জন্যে যে ক্ষতি তা মুসলমান সমাজের ক্ষতি নয়, তা মালয়ালম সাহিত্যের ক্ষতি। যদি নারীর ঋতুমতী হওয়ার কথা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে তা হলে

ছন্নছাড়াদের কথা লিখলে সাহিত্যের কৌলীন্যে ঘা লাগবে বলে যারা নাক সিঁটকোয় তাদের অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। বশীরের এই বই আমাদের মধ্যেকার এক বৃহৎ জনসমষ্টির সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের আগের চেয়েও বেশি করে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে, আমি এইমাত্র বলতে পারি।

'বাল্যসখী' লেখকের তুলি ভোঁতা হয়ে যায় নি। লেখক এখন যুবক। এই লেখার পর তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক সৃষ্টি তাদের জন্মের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। তারাও ঠিক একইভাবে খ্যাতিলাভ করুক এই কামনা করে আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করছি।

এম. পি. পল

বাল্যসখী

ছোটোবেলা থেকেই সুহ্‌রা আর মজিদ খুব বন্ধু। তার আগে অবধি কিন্তু তারা পরস্পরের ভীষণ শত্রু। ওরা দুজনেই ছিল প্রতিবেশী, তাদের দুই পরিবারের মধ্যে ভাবও ছিল খুব কিন্তু সুহ্‌রা আর মজিদ ছিল পরস্পরের শত্রু। তখন সুহ্‌রার বয়স ছিল সাত আর মজিদের নয়। দুজন দুজনকে দেখলেই হয় জিভ ভ্যাঙাত নয় একে অন্যকে ভয় দেখাত।

দুজনের শত্রুতা সমানে চলছে এমন সময় গরমকাল এল, তখন আম পাড়ার ধুম—সুহ্‌রার বাড়ির কাছের আমগাছটায় আম পেকে টুপটাপ পড়তে শুরু করেছে কিন্তু একটাও সুহ্‌রার কপালে জোটে না। যেই আম পড়ার শব্দ হয় সুহ্‌রা হাঁফাতে হাঁফাতে ছোটে কিন্তু গিয়ে দেখে মজিদ তার আগে পৌঁছে আম খেতে শুরু করেছে। মজিদ সুহ্‌রাকে একটা আমও দেয় না। যদিও বা দেয় আদ্ধেকটা খেয়ে, তাও সুহ্‌রা যখন হাত বাড়ায় তখন 'এই নে' বলে ওর ডান কনুইটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরে। এ ছাড়াও সুহ্‌রার সঙ্গে দেখা হলেই মজিদ ওকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, চোখ গোল করে, জিভ বার করে, ভুরু পাকিয়ে মজিদ যখন সুহ্‌রার দিকে এগিয়ে আসে তখন যে কোনো মেয়েরই তা দেখে ভিরমি লেগে যাবে কিন্তু সুহ্‌রা অত সহজে ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়, সুহ্‌রাও চোখ গোল করে, জিভ ভেঙিয়ে মজিদকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমের ব্যাপারটাতেই সুহ্‌রাকে হার মানতে হয়। একটা আমও ও পায় না। ঝড় উঠুক বা না উঠুক সুহ্‌রা আমতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু আশ্চর্য তখন আমগাছটার একটা পাতা পর্যন্ত নড়ে না। গাছটা পাকা আমে ভর্তি, না পড়লে ও গাছে উঠে পাড়তে পারে কিন্তু বড়ো ভয় করে ঐ লাল পিঁপড়েগুলোকে। কামড়ে একেবারে শেষ করে দেবে। তবে পিঁপড়ে থাকলেও কি সুহ্‌রা গাছের ওপর চড়ে আম পাড়তে পারে নাকি? হাজার হোক্ ও মেয়ে—মেয়েছেলের গাছে ওঠাটা বড়ো খারাপ দেখায়।

একদিন মুখভর্তি জল নিয়ে ও আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ডালপালার মধ্যে একটা আলোড়ন তুলে কী যেন একটা ধপাস করে পড়ল। সুহ্‌রা ছুটে গিয়ে কুড়োতে গিয়ে দেখে ডাবের মুচি। বেচারা খুব লজ্জায় পড়ল, পেছন ফিরে দেখল কেউ ওকে দেখছে কিনা—নাঃ কেউ দেখছে না কিন্তু আম গাছ থেকে ডাবের মুচি পড়ল কি করে? ও এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সেই ছোঁড়াটা, মজিদ যেন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি ভাবে মুখ দিয়ে 'জুগজুগু জুগজুগু' একটা শব্দ করতে করতে আমগাছটার

তলায় এসে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল নয়, চোখদুটো গোলগোল করে, জিভ অনেকখানি বের করে সুহ্‌রাকে ভয় দেখাতে লাগল।

মজিদের সেই ভীষণ চেহারা দেখলে গ্রামের সব মেয়েরা 'ও মা' বলে চীৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে যেত কিন্তু সুহ্‌রা সেরকম ভয় পাবার মেয়ে নয়। ও সে জায়গা থেকে এক পাও নড়লো না। উপরন্তু মাথা একদিকে হেলিয়ে, চোখ গোল গোল করে জিভ বার করে মজিদকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করল।

মজিদের ভীষণ রাগ হল। পুঁচকে একটা মেয়ে, ওর মতো একটা জোয়ান ছেলেকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে? ও সুহ্‌রার আরো একটু কাছে এগিয়ে এল। চোখদুটো আরো গোল করে, ভুরু পাকিয়ে, নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে ভীষণ জোরে একটা আওয়াজ বার করল—ঝুঁ। উঃ কী ভীষণ সেই আওয়াজ। যে কোনো মেয়ে সেই শব্দ শুনে ভয়ে পালিয়ে যেত কিন্তু সুহ্‌রা সে মেয়ে নয়। ও চোখদুটো আরো গোল করে, ভুরু উঁচিয়ে, নাক ফুলিয়ে বলল—ঝুঃ।

মজিদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঐ একরত্তি একটা দুধের বাচ্চা তার এতখানি সাহস? ওর বাবা সামান্য সুপুরির কেনাবেচা করে, ও কিনা কাঠের ব্যবসায়ীর ছেলেকে ভয় দেখাতে এসেছে। শুধু তাই নয়, ও মেয়েরা তো চিরদিনই ছেলেদের ভয় করে এসেছে। মজিদও আরো কাছে এগিয়ে এল কিন্তু সুহ্‌রা এক চুলও সরল না। মজিদের অহংকারে ভীষণ ঘা লাগল, ওর খুব রাগও ধরল। দাঁড়া ছুঁড়ি! তোর মজা আমি দেখাচ্ছি।

—এই ছুঁড়ি তোর নাম কি? বলে ও সুহ্‌রার হাতের তালু খুব শক্ত করে ধরল। নাম ও জানে, নাম জানার ওর দরকার নেই তবু কিছু একটা জিজ্ঞেস করে ওর প্রতাপটা তো মেয়েটাকে দেখাতে হবে। হাজার হোক ও ছেলে।

মজিদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন এক্ষুনি সুহ্‌রাকে গিলে খাবে। সুহ্‌রার ছোট্ট দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল।? ওর ধারালো নখগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। এক মুহূর্ত কী যে ও করবে ভেবে পেল না। মজিদের হাতটা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করবে না খিমচে ক্ষতবিক্ষত করবে ও ভাবতে লাগল। 'এই ছুঁড়ি তোর নাম কি?'—উঃ কি আস্পদ্দা ছেলেটার! ওর আব্বা, ওর আম্মা কেউ ওকে আজ পর্যন্ত 'ছুঁড়ি' বলে ডাকে নি, তুই তোকারি করে নি, আর এই বদমাইশ ছেলেটা, যে কোনোদিন ওকে একটা আম দেয় নি, তার বদলে শুধু ডান কনুই দেখিয়েছে সে কিনা ওকে 'ছুঁড়ি' বলে ডাকছে আর তুই তোকারি করছে? ও আর সইতে পারল না, হঠাৎ ওর বাঁ হাতের তীক্ষ্ণ নখগুলো দিয়ে মজিদের ডান হাতে খুব জোরে খিমচে দিল।

উঃ, হাতটা যেন জ্বলে গেল। মজিদ তাড়াতাড়ি সুহ্‌রার হাত ছেড়ে দিয়ে 'আম্মা' বলে চীৎকার করে উঠল। চীৎকার করার ইচ্ছে ওর অবশ্য ছিল না, যন্ত্রণায় হঠাৎ গলা দিয়ে আওয়াজ বেড়িয়ে গেল। সুহ্‌রাকেও খিমচে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে ভাবল কিন্তু হাতে ওর একটাও নখ নেই। সুহ্‌রাকে অবশ্য ও কয়েক ঘা দিতে পারে কিন্তু তার

বদলে সুহ্‌রাও যে ওকে মারবে না তার কোনো গ্যারাণ্টি নেই। একবার তো ওকে খিমচে দিয়েছে তার পর লোকে যদি জানতে পারে যে সুহ্‌রা মেয়ে হয়ে ওকে মেরেছে তা হলে একেবারে যা তা ব্যাপার হবে। তার চেয়ে সব ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভালো। ও তাই কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুহ্‌রা ওকে দাঁত ভেঙালো, মজিদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুহ্‌রা ওকে নকল করে বলল—উঃ আম্মা।

তাতেও মজিদ কিছু বলল না। ওর অপমানের বদলা নেবার জন্যে ও সুহ্‌রাকে এমন কিছু বলার জন্য ভাষা খুঁজতে লাগল যাতে সুহ্‌রা আর টুঁ শব্দটি না করতে পারে। কিন্তু কী যে বলবে ভেবে পেল না। ভীষণ কিছু একটা বলতে হবে কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। ও এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। কলাগাছগুলোর আড়ালে খড়ে ছাওয়া মাটির দেয়াল দেওয়া সুহ্‌রার বাড়ি আর নারকেল গাছগুলোর আড়ালে টালি দেওয়া চুনকাম করা মজিদের বাড়ি। হঠাৎ ওর মাথায় সুহ্‌রাকে জব্দ করার এক উপায় খেলে গেল। এ শুনলে লজ্জায়, অপমানে সুহ্‌রার মুখ কালো হয়ে উঠবে। ও বলল—আমাদের বাড়ি টালি ছাওয়া।

এতে অহংকারের কী আছে? ওদের বাড়ি খড়ে ছাওয়া, কাঁচা মাটির কিন্তু তাতে কমটা কোনখানে ও বুঝতে পারল না। ও আবার জিভ ভেঙিয়ে ঠাট্টা করে বলল—উঃ আম্মা।

তার উত্তরে মজিদ বলল, সুহ্‌রারা গরিব। ওর আব্বা সুপুরির কেনাবেচা করে আর মজিদের আব্বার বিরাট কাঠের ব্যবসা! কিন্তু এতেও সুহ্‌রা গর্বের কিছু দেখতে পেল না। মজিদ নামে একটা প্রাণী সে ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখার ভান না করে ও আম গাছের ওপরটা দেখতে লাগল।

মজিদের এবার কান্না পেতে লাগল। অপমান! পরাজয়! সব মিলিয়ে ওর ভীষণ খারাপ লাগল। ওর ইচ্ছে করছিল বোকা পাঁঠার মতো 'ব্যা' করে কাঁদতে। কাঁদলে হয়তো একটু ভালো লাগবে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, কেন, কাঁদবে কেন—ছিঃ। হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এমন একটা জিনিস ও জানে যা আর কেউই জানে না। ওর সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়ে ও এক্ষুনি সুহ্‌রাকে হারিয়ে দেবে।

ও একবার আকাশের দিকে তাকাল, একবার মাটির দিকে তাকাল। তারপর সগৌরবে ঘোষণা করল—আমি আম গাছে চড়তে পারি।

সুহ্‌রার চোখদুটো স্থির হয়ে গেল। আমগাছে চড়তে পারে? হ্যাঁ আমগাছে চড়া চাট্টিখানি কথা নয়। ও সত্যিই হতভম্ব হয়ে গেল। মজিদ যদি গাছে চড়ে তা হলে ওকে কি আম দেবে? ও তাই আগেভাগে ওর দাবি জানিয়ে রাখবে ঠিক করল। হাতের সামনে দুটো পাকা আম দেখিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে সুহ্‌রা বলল—এই ছেলেটা, সামনের ঐ পাকা আমদুটো আমার। আমি আগে দেখেছি।

মজিদ চুপ করে রইল।

ছেলেটা চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয়ই পিঁপড়ের ভয়ে।

ও বলল—ওঃ পিঁপড়ের ভয় করছে বুঝি?

সুহ্‌রার গলার স্বর, ওর হাবভাব মজিদের একটুও ভালো লাগল না। ওর ভীষণ রাগ হল। পিঁপড়ে? পিঁপড়ের ভয় করবে ও? গাছ যদি কাঁকড়াবিছেতেও ভর্তি থাকে তা হলেও গাছে উঠতে ভয় পায় না।

মজিদ মুণ্ডু[১] হাঁটুর ওপর তুলে গাছে উঠল। উঠতে গিয়ে এখানে ওখানে ছড়ে গেল। পিঁপড়েও দু চারটে কামড়ালো কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ না করে ও পাকা আম দুটো পেড়ে যেন যুদ্ধে জয় করে এসেছে এমনি ভাবে গাছ থেকে নামল। সুহ্‌রা ওর কাছে ছুটে হাত বাড়িয়ে বলল—আমার আমদুটো দাও।

মজিদ কোনো কথা বলল না।

—কই দাও না আম দুটো, আমি তো আগে দেখেছি।

মজিদের সুহ্‌রাকে দেখতে খুব মজা লাগছিল। উঃ মেয়েটা কি হ্যাংলা! ও পেছন ফিরে আমদুটো নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে বলল—আঃ কি সুন্দর গন্ধ!

সুহ্‌রার ভীষণ রাগ হল। ওর যে কিরকম রাগ হচ্ছিল তা ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। আর ও থাকতে পারল না, ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মজিদ ওর কাছে এল। এবার ওর প্রাধান্য জাহির করবার সময় এসেছে। ও আমদুটো সুহ্‌রার সামনে বাড়িয়ে দিল। লোভ হলেও সুহ্‌রা হাত বাড়িয়ে দিল না। মজিদ তখন আমদুটো ওর হাতে গুঁজে দিল কিন্তু সুহ্‌রা হাত শক্ত করে রাখল। ও এখনও মজিদকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মজিদ হঠাৎ এত ভালো হয়ে যাবে এ ও ভাবতে পারছে না। ও হাতদুটো পেছনে সরিয়ে রাখল। চোখ দিয়ে ওর তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে, ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ বেশ গর্বের সঙ্গে বলল—আরো চাইলে পেড়ে দেব।

সুহ্‌রার মনটা গলে গেল। আরো চাইলে আরো পেড়ে দেবে? ওঃ কি ভালো ছেলে রে! আর কি সাহস! আহা কেন ও ছেলেটাকে খিমচোলো। ও খুব আস্তে আস্তে বলল—আমার একটা হলেই হবে।

মজিদ খুব নিঃস্বার্থভাবে বলল—সবগুলো নে।

—নাঃ আমার একটাই যথেষ্ট।

সুহ্‌রা একটা আম নিয়ে আর একটা মজিদের দিকে এগিয়ে দিল। মজিদ 'চাই না' বলল কিন্তু সুহ্‌রা জোর করতে লাগল। বলল, না নিলে ও আবার কাঁদবে।

---

১ মালয়ালীদের জাতীয় পোষাক। চার হাত ধুতি।

মজিদ আমটা নিল। আম খেতে খেতে কি ভাবে আমের রস সারা গায়ে গড়িয়ে পড়ছে সুহ্‌রা তাই দেখছিল, হঠাৎ ও দেখতে পেল মজিদের সারা গায়ে পিঁপড়ে কামড়ে লাল করে দিয়েছে। ওর খুব কষ্ট হল। আহা বেচারা! ওর জন্যে আম পাড়তে গিয়েই না মজিদের এই দুর্দশা। ও মজিদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মজিদের গা থেকে সব নোংরাগুলো খুঁটে খুঁটে ফেলে দিতে লাগল। সুহ্‌রার নখগুলো মজিদের গায়ে ছুঁতেই মজিদের কেমন যেন খারাপ লাগছিল।

সেদিন সুহ্‌রা মজিদকে আবার খিমচে না দিলেও পরে অনেকবার ও মজিদকে খিমচে দিয়েছে। ও যেমনি বলত 'খিমচে দেব' অমনি মজিদ ভয় পেয়ে যেত। সেই থেকে মজিদ ফাঁক খুঁজছিল কেমন করে ওর ওই ধারালো নখগুলোকে কাটবে। সে সুযোগও মিলেছিল। সুহ্‌রার পূর্ণ সম্মতি নিয়েই অবশ্য মজিদ সুহ্‌রার নখগুলো কেটে ফেলেছিল।

দুই

একদিন সকালবেলায় মজিদ আর সুহ্‌রা প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে ফুলের ডালপালা সংগ্রহ করে আনছিল—মজিদের বাড়ির উঠোনে একটা ফুলের বাগান বানাবার জন্যে। সুহ্‌রা ডালপালাগুলো বয়ে আনছিল। মজিদ ওর আগে আগে হাঁটছিল। সমস্ত বোঝা সুহ্‌রার ওপর। মজিদ পুরুষমানুষ নয়? ও কি এইসব ডালপালা বয়ে আনবে নাকি?

মজিদের হাতে একটা খোলা পেন্সিল কাটা ছুরি। ভবিষ্যতে ও কত বড়ো কাজ করবে সে সম্বন্ধে ও সুহ্‌রার কাছে গল্প করছিল। সুহ্‌রা ওর কথায় সায় দিচ্ছিল। কখনও আনন্দ বা আশ্চর্য প্রকাশ করছিল। মজিদের স্বপ্নগুলোর তুলনা নেই। এই সোনা রঙ মাখানো পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি যদি মজিদ হয় সুহ্‌রা তা হলে তার পাটরানী। এতে যদি মজিদের কোনো আপত্তি থাকে তা হলে সুহ্‌রা কাঁদতে শুরু করবে, নখগুলো বাড়িয়ে দেবে। তাই মজিদকে অনেক ভেবেচিন্তে গালগল্প করতে হয়। এত সাবধান হয়েও মাঝে মাঝে ও ভুল করে ফেলে।

মজিদ গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। ভবিষ্যতে ও একটা বিরাট অট্টালিকা তৈরি করবে। সেই অট্টালিকার দেয়ালগুলো হবে সব সোনার, তার বারান্দাগুলো হবে সব মণিমাণিক্য দিয়ে তৈরি, আর ওপরটা যে কি রকম হবে তা আর ওর চিন্তায়ই আসে না। সুহ্‌রা ওর কথায় সায় দেয় না বলে বোধহয় ও কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

—সুহ্‌রা।

—কি মজিদ?

—তুই কিছু বলছিস না যে?

—কেন, আমি তো সায় দিচ্ছি। আর তুমি আমাকে তুই তোকারি করছ কেন?

ও রাগে মজিদকে খিমচে দিল। মজিদ ওর পেন্সিল কাটা ছুরিটা নিয়ে ওর দিকে ফিরল। সুহ্‌রাও ওর নখগুলো এগিয়ে ধরেছে। চোখ গোলগোল করে ও মজিদকে ভয় দেখাল।

—এই দেখ, এক্ষুনি তোমাকে আমি খিমচে দেব।

আগের খিমচোনির কথা মজিদের খুব ভালো করে মনে আছে। ওঃ নখসুদ্ধু সুহ্‌রার চেহারাটা কী ভীষণ দেখাচ্ছে। ওর যদি ঐ নখগুলো না থাকত। অবশ্য নখবিহীন সুহ্‌রাকে ও কোনোদিন দেখে নি। আর সুহ্‌রাটা কি পাজি। এই নখগুলো ব্যবহার করতে ওর একটুও কুঁড়েমি নেই। নাঃ এই অবস্থায় ওকে আর রাগিয়ে লাভ নেই।

সুহ্‌রা যেন ওকে বিনা কারণে খিমচে দিয়েছে এমনি ভাবে মজিদ বলল—সুহ্‌রা, আমাকে খিমচোলে কেন?

—তুমি আমাকে 'তুই তোকারি' করছ কেন?

—কখন আমি তোমাকে 'তুই' বল্লাম? তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলে।

মজিদের হাবভাব দেখে সুহ্‌রার মনটা গলে গেল। মজিদ কি সত্যিই ওকে 'তুই তোকারি' করেছে কে জানে? কিন্তু না বললেই বা ওর ওরকম মনে হবে কেন? তবে মজিদকে খিমচে দেওয়াটা ওর ঠিক হয় নি...আহা ওর হাতে চারটে লাল মোটা আঁচড়ের দাগ। সত্যি ও বড়ো নিষ্ঠুর।

ওর চোখদুটো জলে ভরে এল। মজিদ যেন কিছুই দেখে নি এমনি ভাবে হাঁটতে লাগল। সাদা বালিভরা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মজিদ আপন মনে বলতে লাগলো—আমি কিছু না করলেও আব্বা আর আম্মা আমাকে মারবে আর বকবে। তারপর আরো কেউ কেউ আমাকে মিছিমিছি খিমচে দেবে, কামড়ে দেবে, শুধু তাদের মজা লাগে বলে। আর আমি এখন ফট্ করে মরে গেলে তারা সব তখন বলবে—আহা মজিদটা যদি আজ থাকত তবু একটা খিমচোবার কাউকে পাওয়া যেত...এইটুকু বলে মজিদ পেছন ফিরে চাইল। খুব মজা! সুহ্‌রার দুগালে দু ফোঁটা অশ্রু—মজিদ খুব খুশি হল।

যেন মজিদের আনন্দে ভাগ নেবার জন্যে শিশু সূর্য টিপিটার ও পাশ দিয়ে উঁকি মারতে মারতে সারা গ্রামটিকে তার স্বর্ণরশ্মিতে ভাসিয়ে দিল। কী সুন্দর সকাল! সারা গ্রাম সোনার আলোয় ভেসে যাচ্ছে, দূরে একটা নদীর ছল্‌ছল্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখির কাকলি গ্রামের সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে। মজিদ এই অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কী যেন একটা অব্যক্ত আনন্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল।

কিন্তু সুহ্‌রার হৃদয়ে আনন্দ নেই। ও এক মহা অপরাধ করেছে। ও শুধু শুধু মজিদকে খিমচে দিয়েছে ভাবতেই ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মজিদের হাতে চারটে মোটা লাল দাগ। ওর এত বড়ো অপরাধের দাগ ও কি করে মুছে ফেলবে? যেন কিছুই হয়

নি এমনি ভাবে ও মজিদকে সেই অট্টালিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ সেই বড়ো বাড়িটার কথা কী যেন বলছিলে? মজিদ প্রথমে কিছু বলল না। একটু পরে বলল—সুহ্‌রা, আমার প্রস্তাবে তোমার সায় আছে তো?

সুহ্‌রা একটু দুঃখের সঙ্গে বলল—হ্যাঁ আমার সায় আছে।

মজিদ কি ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না?

—হ্যাঁ, তারপর—তারপর বাড়িটা হবে ঐ উঁচু টিপিটার ওপর।

টিপিটার ওপর হলে সমস্ত গ্রামটা দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, গ্রামের দুটো নদী একজায়গায় মিশে একটা বড়ো নদী হয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে তাও দেখা যাবে। মজিদ, সুহ্‌রা আর গ্রামের আরো অনেক ছেলেমেয়ে কতবার ঐ টিপিটার ওপর উঠে দেখেছে। ওখানে যদি মজিদ ওর প্রাসাদ তৈরি করে তা হলে সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে।

সুহ্‌রা খুব কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, তা হলে বাড়িটা কত উঁচু হবে?

উচ্চতার কি কোন মাপ আছে? মজিদ বলল, খুব উঁচু।

খুব উঁচু বলতে কতটা বোঝায় সুহ্‌রা জানে না। ও জিজ্ঞেস করল—কলাগাছের মতো উঁচু?

কলাগাছের মতো! মজিদের উপমাটা একটুও ভালো লাগল না। কলাগাছের মতো উঁচু অট্টালিকা!

'ফুঃ' বলে ও সুহ্‌রার দিকে তাকিয়ে দেখল।

তখন সুহ্‌রা জিজ্ঞেস করল—তা হলে কি নারকেল গাছের মতো উঁচু?

তাতেও মজিদ ওকে ঠাট্টা করাতে ও আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু সন্দেহের স্বরে জিজ্ঞেস করল, আকাশছোঁয়া বাড়ি?

হ্যাঁ—মজিদের এবার কোনো আপত্তি নেই। হ্যাঁ, আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। সুহ্‌রার তখন আবার অন্য সন্দেহ—

ঐ বাড়িটাতে তুমি কি একা থাকবে নাকি?

মজিদ আরব্য উপন্যাসের গল্প মনে করে বলল—কেন? একা থাকব কেন? আমি আর শাহ্‌জাদী থাকব।

শাহ্‌জাদী? ঐ নামে তো কোনো মেয়ে গ্রামে নেই। তবুও—কে ঐ মেয়েটা?

মজিদ খুব রহস্য করে বলল—সে আছে একজন।

এ কথা শুনেই সুহ্‌রার মুখ শুকিয়ে গেল। ওর রাগও হল। দুঃখও হল। ও সঙ্গে সঙ্গে ফুলের ডালপালাগুলো মাটিতে ফেলে দুচোখ ভরা জল নিয়ে বলল—তোমার শাহ্‌জাদীকে এগুলো নিয়ে যেতে বলো।

মজিদ আদেশ করল—শিগ্‌গির এগুলো উঠিয়ে নাও।

—আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তোমার শাহ্‌জাদীকে এগুলো নিয়ে যেতে বলো।

ওর এই করুণ অবস্থা দেখে মজিদের মন গলে গেল। ও সুহ্‌রার কাছে গিয়ে বলল—সুহ্‌রা, তুমিই আমার...

—কি?

—শাহ্‌জাদী।

সুহ্‌রার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—

সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

সুহ্‌রা খুব খুশি হল। ও আর মজিদ দুজনে বেশ ঐ বাড়িটায় থাকবে। কি মজাই না হবে। ও চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মজিদ ওর নখগুলো কাটার জন্যে এগিয়ে এল।

—ছাড়ো, ছাড়ো।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির সময় পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশের মতো সুহ্‌রা চোখে জল নিয়ে মৃদু হাসল।

—নাঃ, আমার নখ কাটতে পারবে না—সুহ্‌রা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

—আর তা ছাড়া আমাকে যা তা বললে আমি খিমচে দেব কি করে?

—সুহ্‌রা, তুমি আমাকে খিমচোবে?

—হ্যাঁ, খিমচোবো, বারবার খিমচোবো।

ও দাঁত কিড়মিড় করে ভুরু উঁচিয়ে মজিদকে খিমচে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এল।

মজিদ ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর কি যেন একটা ভীষণ খারাপ কথা মনে পড়ছে এমনিভাবে বলল—শাহ্‌জাদীরা আঁচড়ায় না।

শাহ্‌জাদী খিমচোলে বা কামড়ালে ভীষণ পাপ হয়। সুহ্‌রা খুব সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো—সত্যি?

—সত্যি। শাহ্‌জাদীদের খিমচোনো উচিত নয়।

সুহ্‌রা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শাহ্‌জাদী যদি খিমচোতেই না পারল তা হলে তার নখ রেখে দরকারই বা কি? ও যেন একটা বিরাট ত্যাগ করছে এমনি ভাবে ওর দুটো হাত মজিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—তা হলে নখগুলো কেটে ফেল।

মজিদ খুব খুশি হয়ে সুহ্‌রার সামনে বসল। সুহ্‌রার তীক্ষ্ণ লম্বা দশটি নখ মজিদ কেটে ফেলল। তারপর ওরা দুজনে মিলে বাগান তৈরি করতে লাগল। মজিদের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনটার তিনদিকে মজিদ ছোটো ছোটো গর্ত খুড়ল। গর্তগুলোয় সুহ্‌রা এক একটা ফুলের ডাল পুঁতে, তাতে মাটি চাপা দিয়ে জল ঢালল। এক একটা গর্তে এক একরকম গাছ পুঁতল। এককোণে একটা জবা ফুলের ডাল পুঁতল। ডালটা

পোঁতার সময় তাতে একটা শুকনো লাল ফুলও ছিল।

রোজ সকালবেলায় সুহ্‌রা মজিদের বাড়ি গিয়ে গাছপালায় জল ঢালে। একদিন সুহ্‌রার আম্মা ওকে জিজ্ঞেস করল—কেন রে তুই রোজ রোজ পানি ঢালিস?

সুহ্‌রা বলল—অন্যের গাছপালা তো নয়।

সেদিন সন্ধেবেলায় সুহ্‌রা আর মজিদ উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। পোঁতা গাছগুলোর গজানো নতুন পাতাগুলোর দিকে দেখিয়ে মজিদ বলল—এ সব গাছ বুঝি সুহ্‌রার?

—আমার না তো কি তোমার?

মজিদ ঠাট্টা করে হেসে বলল,—উঃ মেয়েটার কি লোভ।

আর যায় কোথায়। রাগের চোটে সুহ্‌রা মজিদকে খিমচে দিল। হাতে নখ ছিল না বলে মজিদের একটুও লাগল না, ও হেসে হেসে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ আরো খিমচোও। আমার সত্যি বেশ আরাম লাগছে।

সুহ্‌রা ওর আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল।

—আমি তা হলে তোমাকে কামড়াব।

ও মজিদের হাত কামড়ে দিতে গেল। উপায় না দেখে মজিদ তখন কোরান ছুঁয়ে বলল—কোরানের তিরিশভাগে বলছে যে শাহ্‌জাদী কামড়াতে পারে না।

সুহ্‌রা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—কাউকেই কামড়াতে পারবে না?

মজিদ মৃদু হেসে বলল—কাউকেই না।

তিন

সুহ্‌রার অঙ্কে খুব মাথা। মাস্টারমশাই তাই ওকে খুব পিঠ চাপড়াতেন আর মজিদকে প্রায়ই মারতেন। অঙ্ক কষতে গেলেই মজিদের সব গোলমাল হয়ে যেত। নানাভাবে চেষ্টা করেও অঙ্ক আর কিছুতেই ঠিক হত না। মাস্টারমশাই ওকে 'মূর্খ শিরোমণি' বলে ডাকতেন। ওর নাম ডাকার সময়ও ঐ নামেই তিনি ওকে ডাকতেন। এ নিয়ে কেউ কিছু অভিযোগ করত না। মজিদের অঙ্কে মাথা নেই। কাজেই ওকে অমনভাবে ডাকলে ও ছেলেমেয়েদের মাঝখান থেকেই উত্তর দিত—উপস্থিত।

—এক আর একে কত হয়?—একবার মাস্টারমশাই মজিদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এক আর একে দুই—এ তো পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে কিন্তু মজিদ এক আর একের সমস্যা এমনভাবে সমাধান করেছিল যে মাস্টারমশাই ওর উত্তর শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। সারা ক্লাসও হাসি চাপতে পারে নি। মজিদের এক আর একের উত্তর নিয়ে তারপর থেকে সকলে খুব হাসাহাসি করত। মাস্টারমশাইয়ের

প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে মজিদ ভাবল যদি দুটো নদী একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটা বড়ো নদী হতে পারে তা হলে দুটো এক একসঙ্গে মিলে একটা বেশ বড়ো এক হবে না কেন? এমনি ভাবে হিসেব করে ও বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল—খুব বড়ো একটা এক।

এইভাবে অঙ্কশাস্ত্রের একটা নতুন থিয়োরি খুঁজে বার করবার জন্যে মাস্টারমশাই ওকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

—খুব বড়ো একটা এক—সকলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। তবুও মজিদ এক আর একে দুই এ কথা মানতে রাজী হল না। মজিদের হাতে ছ বার আস্তে আস্তে বেত মেরে মাস্টারমশাই বললেন—সবসুদ্ধু তোকে আমি একটু বড়ো করে একবার মারলাম।

এরপরে ওর ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই বলত—খুব বড়ো একটা এক।

এই হাসিঠাট্টা মজিদের খুব খারাপ লাগত। ও যা বলেছে তা ঠিক কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না কেন সেটাই ও ভেবে পায় না। কি জানি সত্যিই ওর হয়তো ভুল হয়েছে। হয়তো ও সত্যিই গাধা। বেচারার খুব কষ্ট হল। ও বাড়ি গিয়ে আম্মাকে সব বলল, আম্মা ওকে ওর দুঃখকষ্ট খোদার কাছে জানাতে বললেন—খোদা কারুর প্রার্থনাই না শুনে পারেন না খোকা।

আম্মার কথামতো ছোট্ট মজিদ খোদার কাছে প্রার্থনা করল—

খোদা আমার অঙ্কগুলো যেন সব ঠিক হয়।

মজিদের খোদার কাছে এই প্রথম প্রার্থনা। বেচারি সকাল-সন্ধে প্রার্থনা করে কিন্তু এত প্রার্থনা করেও কোনো ফল হল না। অঙ্কগুলো সব ভুল হতে লাগল। মজিদকে এর জন্যে অনেক মারও খেতে হল। হাতের তালু ওর ব্যথা করতে লাগল। বেচারি মজিদ আর সইতে পারল না। ও ওর দুঃখের কথা সুহ্‌রাকে বলল। অনেক ঝগড়াঝাঁটির পর অবশ্য 'খুব বড়ো একটা এক' বলার পর মজিদ কারুর সঙ্গেই কথাবার্তা বেশি বলত না। পাশের বেঞ্চে বসে সুহ্‌রা ওর দিকে তাকিয়ে দেখত মজিদ মুখ ফিরিয়ে নিত। শেষ পর্যন্ত মজিদই প্রথম কথা বলল। সুহ্‌রা একটু হাসল। ও ওর জায়গা বদল করে মজিদের কাছাকাছি বসল। এবার থেকে মজিদের মার খাওয়া বন্ধ হল। মজিদের সমস্ত অঙ্ক ঠিক।

—মাস্টারমশাই খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন—আরে আমি যে ভেবেছিলাম তোর মাথা একেবারে গোবরে ভর্তি কিন্তু তা তো নয় দেখছি!

এমনিভাবে মাস্টারমশাইয়ের প্রশংসায় আস্তে আস্তে ওর বদনাম ধুয়ে ফেলল। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বেশ একটু ঈর্ষার সঙ্গে বলাবলি করতে লাগল—মজিদই এখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

এসব শুনে সুহ্‌রা মৃদু মৃদু হাসত। ওর এই হাসির অর্থ অবশ্য কেউ বুঝত না। সুহ্‌রার মৃদু হাসির মধ্যে মজিদের অঙ্ক ঠিক হওয়ার রহস্য লুকিয়ে ছিল তা অবশ্য কেউ জানতে পারল না।

স্কুল থেকে ফেরার পথে আর কেউ যাতে না শুনতে পায় এমনি ভাবে সুহ্‌রা মজিদকে নিয়ে ঠাট্টা করত। ও একটা কিছু ভেবে মৃদু মৃদু হাসত আর বলত—খুব বড়ো একটা এক।

মজিদের সমস্ত রাগ তখন শুধু একটা কথার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতো—

শাহ্‌জাদী।

তা শুনে সুহ্‌রা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখত। নখগুলো খুব সুন্দর করে কাটা। সুহ্‌রা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সে তুলনায় মজিদ খুব নোংরা। মজিদের কাপড়ে কালির দাগ বা অন্য কিছুর দাগ একটা থাকবেই।

মজিদ গ্রামের সব আমগাছগুলোয় চড়বে। গাছে উঠে ছোটো ছোটো ডালগুলো ধরে পাতার ভেতর দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে ওর খুব ভালো লাগে। দূরে চক্রবালের ওপারে অন্য যেসব লোকালয় আছে তা দেখার, তাদের জানার ওর খুব আগ্রহ। গাছের ওপর চড়ে ও যখন এই রকম ভাবনায় ডুবে থাকত তখন নীচ থেকে সুহ্‌রা ডেকে জিজ্ঞেস করত—মক্কা দেখতে পাচ্ছ?

মজিদ তার উত্তরে দূরে মেঘের বুকে ভেসে যাওয়া চিলের গান শুনতে শুনতে বলত—মক্কা দেখতে পাচ্ছি, মদীনার মসজিদও দেখতে পাচ্ছি।

চার

সুহ্‌রার কানফুটোনো উৎসবে[১] মজিদ ভাগ নিয়েছিল। অসহ্য বেদনা নিয়ে তাও লুকিয়ে।

মজিদ ছুন্নতের পর বিছানায় শুয়েছিল। তখন স্কুলের ছুটি, মজিদের ছুন্নৎ উৎসবে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। খুব বাজি পোড়ানো হয়েছিল তারপর একটা বিরাট ভোজও দেওয়া হয়েছিল। গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে, হাতির ওপর মজিদকে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষে বিরাট ভোজ। হাজারের ওপর লোক নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভোজের আগে ছুন্নৎ শেষ হয়েছিল। সেদিন সারাদিন মজিদের ভয় করছিল। কী কাটবে? ওকি মরে যাবে? ভয়ে ও একেবারে কাঁটা হয়ে

১ মুসলমান মালয়ালী মেয়েদের খুব ছোট্টবেলায় কান ফোটানো হয়। ডান কানে এগারোটা আর বাঁ কানে দশটা ফুটো করা হয়। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে এ প্রথা উঠে যাচ্ছে।

গিয়েছিল। সেদিন সন্ধে অবধি ও আর বাঁচবে না এই ধারণা ওর হয়েছিল। কি যে হবে, ওকে নিয়ে যে কী করা হবে সে সম্বন্ধে ভেবে ভেবে ও দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মুসলমান পুরুষদের ছুন্নৎ হয়। এমন কেউ নেই যে যার এটা হয় নি। তবু এটা কিভাবে করা হয় ওর জানার ভীষণ আগ্রহ। ও সুহ্‌রাকে জিজ্ঞেস করল।

সুহ্‌রা অবশ্য এসব বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না।

—যাই হোক্ না কেন, তুমি মরবে না—সুহ্‌রা ওকে আশ্বাস দিল।

তবু মজিদের ভয় ভাঙল না। হঠাৎ 'আল্লাহো আকবর' শব্দে প্যাণ্ডেল গমগম করে উঠল। তখন মজিদকে ওর আব্বা একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেখানে সাদা কাপড় বিছানো একটা উঁচু জায়গার সামনে এগারোটা সলতে লাগানো একটা প্রদীপ জ্বলছিল। ঘরেতে নাপিত ছাড়া আরো দশ বারোজন লোক ছিল। তারা মজিদের সার্টটা খুলে ফেলল। গায়ের কাপড়ও খুলে তারপর ওকে নগ্ন করে উঁচু জায়গাটায় বসাল। কী আশ্চর্য—এরা এখন কী করতে চলেছে?

মজিদের চোখ বেঁধে দেওয়া হল। ওর হাত, পা, মাথা লোকগুলো চেপে ধরল। ওর আর নড়াচড়ার শক্তি রইল না। 'আল্লাহো আকবর' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মজিদ খুব ঘামছিল—এই হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ ওর উরু দুটোর সঙ্গমস্থলে একটা ব্যথা অনুভব করল। শুকনো সুপুরির খোলা চেরার মতো একটা অনুভূতি। এক নিমেষ মাত্র। খুব তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল।

একটা ব্যথা—একটা জ্বালা।

মজিদকে শুইয়ে দেওয়া হল। মাথায় আর পায়ে বালিশ দেওয়া হয়েছে। গোলমালের মধ্যে মজিদ একবার চেয়ে দেখল। লালকালির বোতলে আঙুল ডোবানো রঙ নয়। আঙুলের মাথায় যেন লাল কালির ছোপের মতো ওই জায়গাটায় রক্ত জমে রয়েছে। পরের দিন সুহ্‌রাকে মজিদ মাত্র এইটুকু বলল। সুহ্‌রা জানলার ওধার থেকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?

—আমি? মজিদ শুয়ে শুয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল—আমি অত সহজে ভয় পাই না।

তখন সুহ্‌রা ওর কান ফুটোনোর কথা বলল। আর দশ বারো দিনের মধ্যে ওর কান ফুটোনো হবে।

—তুমি তো আসতে পারবে না।

—কেন পারব না? মজিদ বলল।

কিন্তু সুহ্‌রার কান ফুটানোর দিন যখন এল তখন মজিদের নড়তে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে সুহ্‌রার আম্মা, আর তার পিছনে পিছনে সুহ্‌রা এসে ওদের বাড়ির সকলকে নিমন্ত্রণ করছে, মজিদ শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল। একটু পরে সুহ্‌রাকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। উৎকণ্ঠায় তার সুন্দর ফর্সা মুখখানা ফ্যাকাসে

হয়ে গেছে। কিন্তু ওর চোখগুলো যেন জ্বলছিল।

—আজ আমার কান ফুটোনোর দিন, সুহ্‌রা বলল।

মজিদ কিছু না বলে মৃদু হাসল। সে হাসির ছোঁয়া সুহ্‌রার মুখে লাগল। মজিদ ওর সুন্দর কানদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখল। অমন সুন্দর কানদুটোয় ফুটো করলে ওর কষ্ট হবে না?

সুহ্‌রা বলল—কিছুই জানতে পারব না। তুমি এসে একবার দেখোই না।

ও ছুটে পালিয়ে গেল।

মজিদের খুব যেতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ওর। তবুও খুব কষ্ট করে কেউ যাতে না দেখতে পায় এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল। উঃ কী ব্যথা, যেন হাজার হাজার ক্ষতের যন্ত্রণা। কোনোরকমে সকলের অজ্ঞাতে বাইরে এল। তারপর অতি কষ্টে বাগানের পাশ দিয়ে সুহ্‌রার বাড়ি এল। ওদের বাড়িতে উৎসবের কোনো সাড়া নেই। লোকজনও বিশেষ কাউকে ও দেখতে পেল না। ওরা গরিব বলে হয়তো বেশি আড়ম্বর করতে পারে নি। বড়োলোক হলে বাজি-বাজনা খাওয়া-দাওয়া সব হত।

মজিদকে দেখে সুহ্‌রার আম্মা চীৎকার করে ছুটে এল—

কী কাণ্ড! তুই কোথা থেকে এলি?

মজিদ একটু অপ্রস্তুতের সঙ্গে বলল—কানফোটানো দেখতে।

এর মধ্যে সুহ্‌রাও এসে গেছে। ওর মুখটা লাল, চোখগুলো ঘোলাটে। ওপর থেকে নীচ অবধি দুটো কানের সব জায়গায় ফুটো করে তাতে কালো সুতো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ডান কানে এগারোটা ফুটো আর বাঁ কানে দশটা। ফুটোর ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেলে সুতাগুলো ফেলে দিয়ে রুপোর বটপাতার দুল পরবে। তারপর সাদীর সময় রুপোর দুলগুলো বদলে সোনার দুল পরবে। এসব অবশ্য মজিদ জানে।

মজিদ সুহ্‌রাকে জিজ্ঞেস করল—খুব ব্যথা লেগেছে?

সুহ্‌রা খুব কষ্টে মৃদু হেসে বলল—হ্যাঁ, একটু লেগেছে।

এর মধ্যে মজিদকে ঘরে দেখতে না পেয়ে মজিদের বাড়ির লোকেরা ওর খোঁজ করতে করতে সুহ্‌রার বাড়িতে এসেছে। দুজন লোকে মজিদকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

এই নিয়ে হৈ চৈ হল। মজিদের আব্বা ওর আম্মাকেও খুব গালাগালি করলেন।

মজিদের ক্ষত আগে শুকোলো। সেদিন মজিদকে খুব ভালো করে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে, আতর মাখিয়ে খুব হৈ চৈ করে ওকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল।

সেই আড়ম্বরের কথা পরে সুহ্‌রা বলল—ঠিক যেন বিয়ে করতে যাচ্ছিলে এমন হৈ হৈ...

পাঁচ

গ্রামের স্কুলের শেষ পরীক্ষায় মজিদ আর সুহ্‌রা দুজনেই পাশ করল। সুহ্‌রার খুব ইচ্ছে ছিল যে শহরের স্কুলে গিয়ে পড়বে কিন্তু সে ইচ্ছে ওর পূর্ণ হল না। এই প্রথম মজিদ মৃত্যু দেখল। সুহ্‌রার আব্বার মৃত্যু।

আব্বার ইন্তেকালের পর সুহ্‌রা, সুহ্‌রার দুটি ছোটো বোন আর ওর আম্মা একেবারে অনাথ হয়ে পড়ল। ওদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল বাড়িটা। ছোট্ট দুটো ঘর, রান্নাঘর আর একটুখানি উঠোন নিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি। সুপুরির কেনাবেচায় যে স্বল্প লাভ হত তাই দিয়ে ওর আব্বা কোনোরকমে সংসার চালাতেন। সাদা একটা টুপি, নোংরা একটা মুণ্ডু আর সেইরকম নোংরা একটা তোয়ালে—এই ছিল ওর আব্বার পোষাক। কালো দাড়ি আর ফর্সা মুখের মধ্যে তাঁর কালো চোখদুটি যেন সব সময় হাসত। সামনে একটু ঝুঁকে, গুটোনো বস্তা বগলের তলায় রেখে ওর আব্বা মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। গ্রামের সব বাড়িগুলো থেকে সুপুরি কিনে বস্তায় ভর্তি করে নিজে বয়ে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন। কথাবার্তা বলতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি অনেক জায়গা ঘুরেছিলেন। সেসব জায়গার গল্প মজিদের কাছে করতেন : গ্রামের বাইরে পাওয়া যায় প্রকৃত মুসলমান। গ্রামের মুসলমানরা সব বড়ো অন্ধবিশ্বাসী, তাদের হৃদয় সব শুকিয়ে কঠিন হয়ে গেছে। যদি আসল মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করতে কেউ চায় তা হলে তাকে গ্রামের বাইরে যেতে হবে।

—এখানকার লোকেদের ধারণা তারাই হচ্ছে আসল মুসলমান, সব অজ্ঞ, সব অন্ধবিশ্বাসী। খোদার কৃপায় তোমরা লেখাপড়া শিখে বড়ো হলে এইসব অন্ধ বিশ্বাস দূর হয়ে যাবে।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশা ছিল যে সুহ্‌রা অনেক লেখাপড়া শেখে, অনেক পাস করে। এই নিয়ে আবার ঠাট্টা তামাশাও তিনি করতেন।

—অনেক পাস করে সুহ্‌রা যখন একজন বড়ো অফিসার হবে তখন ও আমাদের সবাইকে ভুলে যাবে। তখন ওর হয়তো আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতেই লজ্জা করবে।

—হ্যাঁ, তা ঠিকই। সুহ্‌রা খুব অহংকারী—মজিদ মিছিমিছি বলে।

তখন সুহ্‌রা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে, জিভ ভেঙিয়ে আস্তে আস্তে বলে—খুব বড়ো একটা এক।

সুহ্‌রা যখন ওকে এইভাবে ঠাট্টা করে তখন মজিদ ওকে আচ্ছা করে জব্দ করে। মজিদের হাতে সব সময় গুলতি আর ছোটো ছোটো ঢিল থাকে। সুহ্‌রার পায়ের গোড়ালি লক্ষ্য করে খুব আস্তে ঢিল ছোঁড়ে। ওর লক্ষ্য কখনও ভুল হয় না। সুহ্‌রার গোড়ালিতে ঢিলটা ঠক্ করে লাগতে মজিদ বলে, 'ওঃ আমি ঠিক তাক করে মেরেছি।

সুহ্‌রা একটুও নড়ে না। ওর চোখদুটো থেকে শুধু দু-এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সুহ্‌রার আম্মা অবশ্য এসব দেখতে পায় না। তবু বলে—তুই এইরকম তাক দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের হাঁড়িকুড়ি সব ভেঙে শেষ করে দিবি যে রে মজিদ। আমাদের কি তোদের মতো পয়সা আছে?

—ঠিক আছে। আমি আর তাক ঠিক করতে আসছি না। আমি শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—ছমাসের রাস্তায়...

—তারপরে অবশ্য সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে আসবে—সুহ্‌রা আস্তে আস্তে বলে।

মজিদ সম্বন্ধে এই হচ্ছে সুহ্‌রার অভিমত। কিন্তু সুহ্‌রার সম্বন্ধে মজিদের অভিমত একেবারে অন্যরকমের।

—হ্যাঁ, তারপর আমি নানাজায়গায় ঘুরে বাড়ি ফিরে এসে দেখব সুহ্‌রা খুব একটা বড়ো অফিসার হয়েছে। তখন শ্রীমতী আমাকে দেখেও না দেখার ভান করবে।

দূর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ও যেন ওর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—সুহ্‌রার চোখমুখ এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়। মিষ্টি হাসি ঠোঁটে এনে বলে—তুমিই তো লেখাপড়া শিখে ভালো কাজকর্ম করবে। আমাদের লেখাপড়া শেখার পয়সা কোথায়?

সুহ্‌রার আব্বা তখন বলে, পয়সা আমাদের খোদা দেবেন। আমরা তিনজনই একসঙ্গে যাব স্কুলে পড়তে। আমি সুপুরি বিক্রি করে রোজ স্কুলের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু তা আর হল না। একদিন বৃষ্টিতে খুব ভিজে দু তিনদিন সুহ্‌রার আব্বা জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়লেন। তিনদিনের দিন সন্ধ্যায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় মজিদ কাছে ছিল। সুহ্‌রার আব্বার চোখদুটো নিভন্ত লণ্ঠনের কালো চিমনির মতো হয়ে গেল, সমস্ত দেহটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পরের দিন তাঁকে কবর দেওয়া হল। সেদিন সন্ধ্যায় আগের মতো সুহ্‌রার অপেক্ষায় মজিদ আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। খুব আস্তে আস্তে বিষণ্ণ মুখে সুহ্‌রা ওর কাছে এল। মজিদ ওর মুখের দিকে চাইতেই ও হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। মজিদ একটা কথাও বলতে পারল না। ওর চোখের জল সুহ্‌রার মাথায় গড়িয়ে পড়ল। আর সুহ্‌রার অশ্রুজলে মজিদের বুক ভেসে গেল। সে সময়ে নারকেল গাছগুলোর কালো মাথার ওপরে চাঁদ ঝিক্‌মিক্ করে হাসছিল।

ছয়

সুহ্‌রা ওদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল। মজিদকে ওর আব্বা শহরের স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ও দেখছিল। দুজনের হাতেই ছাতা—মজিদেরটা নতুন। মজিদের সার্ট, মুণ্ডু, টুপি সব নতুন। গ্রামের পথ দিয়ে আস্তে আস্তে ওরা মিলিয়ে গেল—ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে মজিদ আমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। ওর হাতে নতুন বই। সুহ্‌রা আসতেই ও বেশ গর্বের সঙ্গে সুহ্‌রাকে বইগুলো দেখালো।

—এতে অনেক ছবিও আছে।

সুহ্‌রা ওর হাত থেকে বই নিয়ে উলটে পালটে দেখল। মজিদ দুমাইল দূরের শহরের অদ্ভুত সব দৃশ্যের বর্ণনা করে স্কুল সম্বন্ধে বলল।

—একেবারে শহরের মধ্যে আমাদের স্কুল। সাদা চুনকাম করা, টালি দেওয়া সাতটা একতলা বাড়ি। এখানকার স্কুলের মতো নয়। খুব একটা বড়ো বাগান। তাতে যে কত রকমের ফুলের গাছ। আমি সব ফুলের বীজ নিয়ে আসব। তারপর কী বড়ো খেলার মাঠ। সত্যিই সবকিছু দেখার মতো। কত ছেলেমেয়ে যে পড়ছে তার কোনো হিসেব নেই। হেড্‌মাস্টারমশাই বেশ লম্বা চওড়া মানুষ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। হাতে সব সময় বেত, হ্যাঁ, তারপর আমাদের মাস্টারমশাইয়ের মাত্র একটা চোখ। আমাদের ক্লাসে বেয়াল্লিশজন পড়ে। তাদের মধ্যে চোদ্দ জন মেয়ে।

হঠাৎ যেন বিষম খেয়ে মজিদ থেমে গেল। বইয়েতে সুহ্‌রার চোখের জল।

—সুহ্‌রা—মজিদ ডাকল। সুহ্‌রার চোখের জলের কারণ ও বুঝতে পারল না। মজিদ বারবার জিজ্ঞাসা করল—কাঁদছ কেন?

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে খুব আস্তে আস্তে সুহ্‌রা বলল—আমারও ওই স্কুলে পড়তে ভীষণ ইচ্ছে।

সুহ্‌রা পড়তে চায়—কী উপায় করা যায়? মজিদ নানাভাবে ভাবল। ভাবনার চোটে ওর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। অবশেষে পথ পাওয়া গেল।

মজিদ বলল—আমি যা রোজ পড়ব, এসে তোমাকে বলব।

অবশ্য এ রফাতে মজিদের মন ভরল না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওর মনে হল, আচ্ছা, ওদের তো অনেক পয়সা, কিছু পয়সা খরচ করে সুহ্‌রাকে পড়ালেই তো হয়। আব্বাকে বলতে একটু ভয় করে, তবে আম্মাকে বলবে বলে ও ঠিক করল।

সেদিন রাতে ভাত খাওয়ার পর আব্বা পানে চুন লাগাচ্ছেন, আম্মা কাছে বসে জাঁতিতে সুপুরি কুঁচোচ্ছে এমন সময় মজিদ খুব দুরুদুরু বুকে আম্মার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল—আম্মা।

—কী রে খোকা?

মজিদ খুব আস্তে আস্তে বলল—আচ্ছা, আমরা তো ঐ ওদের সুহ্‌রাকেও পড়াতে পারি।

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। আব্বা পান মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। তারপর ঝকঝকে একটা পেতলের ছোট্ট বাক্স থেকে একটা রুপোর কৌটো বার করলেন। কৌটো থেকে একটা কটু গন্ধঅলা পাতা বের করে হাতের তালুতে তাকে পিষে মুখে ফেললেন। তারপর উঠোনে গিয়ে পানের পিক ফেললেন। আম্মা পিকদানীটা এগিয়ে দিয়ে বলল—এতে ফেলো না বাপু। তোমার পানের পিকে মজিদের ফুলগাছগুলো যে নষ্ট হয়ে যাবে।

—নিকুচি করেছে ওর ফুলগাছের।

রেগে আব্বা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। দিনের আলোর চেয়েও প্রখর হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোতে আব্বার ফ্ল্যানেল সার্টের সোনার বোতামগুলো ঝক্‌ঝক্ করছিল। আব্বার কালো ভুরু দুটো ওপরে উঠল, ধানের খুদের রঙের চক্‌চকে কপাল কুঁচকে উঠল। সোনার ফ্রেমের গোল কাঁচের ভেতর দিয়ে আব্বা মজিদকে একবার দেখলেন তারপর মজিদের সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করলেন—মজিদের আম্মা, শোনো, তোমার এই ছেলেটা কিছুদিনের জন্যে একটু বাইরে ঘুরে আসুক। কত ধানে কত চাল হয় শিখুক। কী, বুঝতে পারলে আমার কথা, না পারলে না?

—এই আরম্ভ হল। কিছু বললেই সঙ্গে সঙ্গে যা এখান থেকে, দূর হয়ে যা এখান থেকে। তা এত কথা সব উঠছেই বা কেন?

—ছেলেটার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই।

—আর সকলের খুব বুদ্ধি আছে বলতে চাও?

আম্মার গায়ে বেঁধানো কথা আব্বা কি অত সহজে ছেড়ে দেন?

—ছেলেটা পেয়েছে তোমার বুদ্ধি। বুঝলে, না বুঝলে না?

—ওঃ এখন আমার বুদ্ধির দোষ হল।

—যদি তোমার বুদ্ধিই না পায় তা হলে ছেলেটা এরকম বোকার মতো কথাবার্তা বলে কেন? আমার আর আমার ছোটো ভাইদের ছেলেপিলে নিয়ে সবসুদ্ধু ছাব্বিশজন। তোমার ভাই আর বোনদের ছেলেমেয়ে একচল্লিশজন। তারা সকলে মিলে এখানে এসে পাত পাড়লে কি আমি কিছু বলি? বলি না।

—উঃ কি জ্বালাতন রে বাপু। তোমার কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝছি না বাপু।

—তুমি বুঝবে না। কোনোদিন বোঝও নি, আজও বুঝবে না।

—বেশ, তা হলে লিখে বোঝাও।

আব্বা লিখতে পারে না।

আব্বা এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বাবার পানের পিক মুখ থেকে

ছিটকে আম্মার কাপড়ে এখানে-ওখানে দাগ ধরে গেল।

—যাও, ওদিকে গিয়ে কাপড় বদলে এসো।

আম্মা গিয়ে কাপড় বদলে এল।

আব্বা আবার শুরু করলেন—লেখা? তোমার আব্বা লেখাপড়া? করেছে? করে নি।

আম্মা কি অত সহজে ছেড়ে দেবে নাকি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কেউ লেখাপড়া করে নি আর তোমাদের সকলে খুব লেখাপড়া করেছে।

আব্বা এর উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। আব্বা লিখতে জানেন না, আব্বার আম্মা, আব্বার আব্বা, কেউই লিখতে জানে না। আম্মা এ কথা মনে করিয়ে দিতে আব্বার ভীষণ রাগ ধরল। আব্বা এবার 'তুই তোকারি' আরম্ভ করলেন—এই মাগী খুব বেশি তড়পাচ্ছিস যে—অ্যাঁ, মেরে তোর হাড়পাঁজরা আমি গুঁড়িয়ে দেব। বুঝেছিস না বুঝিস নি?

এর উত্তরে আম্মা কিছু বললে ভীষণ ঝগড়া লেগে যাবে। আব্বা রেগে পিকদানী উঠোনে ছুঁড়ে ফেলবেন, আম্মাকে ঠ্যাঙাবেন, মজিদ আর মজিদের বোনদেরও বাদ দেবেন না। শুধু তাইই নয়, মজিদের সমস্ত গাছপালা উপড়ে ফেলে দেবেন। আম্মা তাই চুপচাপ রইল। আম্মা কিছু বলছে না দেখে আব্বা জিজ্ঞেস করলেন—কি গো, তোমার জিভ কি নীচে নেমে গেল নাকি?

আম্মা খুব শান্তভাবে বলল—এত সব কথা উঠছেই বা কেন? মজিদ ছেলেমানুষ, নাহয় একটা কথা বলেই ফেলেছে। খোদার দয়ায় আমাদের তো পয়সাকড়ির অভাব নেই। ঐ সুহ্রার আব্বা ইন্তেকাল করেছে। ওদের আর এখন কেউই নেই। মেয়েটার পড়াশুনো করার বড়ো ইচ্ছে। আমরা যদি মেয়েটার পড়ার খরচ দিই তাতে আমাদের এমন কী লোকসান?

মজিদ খুব আগ্রহভরে আম্মার কথাগুলো শুনছিল। আম্মার কানে, গলায়, হাতে সোনার গয়নাগুলো সব ঝলমল করছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের অনেক টাকাপয়সা আছে। বলি এসব পয়সা তোমার আব্বা কামিয়েছে না তোমার সাদীর পণের টাকা—অ্যাঁ?

—বাস্, আরম্ভ হল পণের টাকা। তুমি যেন কিছু না নিয়েই সাদী করেছিলে। হাজার টাকা গুণে নিয়েছ, তারপর হাত পা ভর্তি করে আমার আব্বা যে সোনার গয়না আমাকে দিয়েছেন তার কথা বোধহয় ভুলে গেছ।

—হুঁ।—আব্বা গোঁফ মোচড়াতে লাগলেন—

তোমার হাজার টাকা। তোমার ও পণের টাকা দিলেও তোমার মতো একটা আস্ত গর্দভকে কেউ বিয়ে করত না।

—তা হলে যাও, গিয়ে খুব বুদ্ধিমতী দেখে আর একটা নিকে করো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিকে করব। আমার মতো একটা লোকের হাতে মেয়ে দিয়ে হাজার কেন দশ হাজার লোক এগিয়ে আসবে। বুঝলে—নাঃ বুঝতে তুমি পারবে না।

আম্মা এর উত্তরে কিছু বলল না। চাইলে আব্বা যত খুশি নিকে করতে পারে। আম্মা কিছু বলছে না দেখে আব্বার রাগ আরো চড়ে গেল।

—ওঃ কি রকম হাঁদার মতো কথাবার্তা! আমাদের প্রচুর টাকা পয়সা আছে!

আব্বা এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যেন আব্বার হাতে একটা পয়সাও নেই। আসল কথা কী তা তো মজিদ খুব ভালো করেই জানে। ওদের গ্রামে সবচেয়ে বড়োলোক ওর আব্বা। এক একবার যখন নারকেল পাড়ানো হয় তখন সারা উঠোনে নারকেল পাহাড়ের মতো জমা হয়ে থাকে। ধান এত হয় যে রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। এ ছাড়াও কাঠের ব্যবসায়ে আব্বার অনেক লাভ হয়। একবার কাঠ বিক্রি করে আব্বা বাড়িতে টাকার বদলে শুধু গিনি এনেছিলেন। গিনিগুলো আব্বা বিছোনো কাপড়ের ওপর রেখেছিলেন—এই উঁচু হয়েছিল। হ্যাজাকের আলোতে সেগুলো সব এক একটি করে গুণে আব্বা থলিতে পুরে বাক্সে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। বাক্সে তালা চাবি দেবার আগে মজিদ গিনিগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছিল। ঝকমকে গিনিগুলোর রিনিঝিনি শব্দ এখনও মজিদের কানে বাজছে। আব্বা এত বড়োলোক তবু একটা গরিব মেয়ের পড়ার খরচ দিতে তিনি এত কার্পণ্য করছেন?

আম্মা বলল—আমাদের টাকাপয়সা নেই বোলো না। এ গাঁয়ের সকলের চেয়ে বেশি টাকাপয়সা আমাদের। সুহ্‌রাকে পড়াতে তো ঐ মজিদের মতোই খরচ হবে?

আব্বার আবার রাগ চড়ে গেল।

—আমি যে বললাম তোমার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। সে কথা তুমি বুঝতে পারো নি—না? আমার আর তোমার আত্মীয়স্বজন মিলে সবসুদ্ধ কত হয় জানো?—জানো না। ছাব্বিশ আর একচল্লিশ কত হয় জানো?—জানো না।

আম্মা জিজ্ঞেস করল—কত হয় রে মজিদ?

মজিদের মাথা ঘেমে উঠল। ও কাগজ পেন্সিল আনতে ছুটল।

আব্বা খুব ঠাট্টার হাসি হাসতে হাসতে বললেন—ঐ—ঐ যাচ্ছে তোমার বুদ্ধি।

মজিদ কাগজ পেন্সিল এনে ছাব্বিশের তলায় একচল্লিশ বসাল, তারপর ঘেমে নেয়ে দুটোর যোগ করতে বসল।

তা দেখে আব্বা হেসে হেসে বসলেন,—ছাব্বিশ আর একচল্লিশ সাতষট্টি।

মজিদেরও তখন যোগ করা হয়ে গেছে। ও'ও বলল— হ্যাঁ সাতষট্টি।

ওর আব্বা গর্জন করে উঠলেন—দূর হ এখান থেকে।

আব্বা তারপর বললেন—সুহ্‌রা মেয়েটা ভালো, বেশ বুদ্ধিমতী কিন্তু ওকে পড়াতে গেলে এই সাতষট্টিজনেরও পড়ার খরচ বইতে হবে। এত টাকা কি আমাদের আছে?

আম্মা কিছুই বলল না।

মজিদকে দেখে আব্বা বললেন—এ হারামজাদাটা এখনও এখান থেকে যায় নি দেখছি। যা এখান থেকে।

মজিদ খুব ক্ষুণ্ণ মনে উঠে পড়ল। ও জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে সুহ্‌রাদের বাড়ির দিকে তাকাল। দেখতে পেল কেরোসিনের ডিবের আলোতে দুই গালে হাত রেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বসে রয়েছে সুহ্‌রা।

সাত

সুহ্‌রার জীবনের এখন যেন কোনো লক্ষ্য নেই। আজকাল বেশির ভাগ সময়ই ও মজিদের বাড়িটায় কাটায়। মজিদের বাড়ির সকলেই ওকে ভালোবাসে কিন্তু সুহ্‌রার মুখে সবসময় বিষণ্ণতার একটা ছায়া। মজিদের আম্মা ওকে প্রায় বলে—মিছিমিছি কেন মন খারাপ করছিস বাছা?

মৃদু হেসে সুহ্‌রা বলে, কেন, মন খারাপ করব কেন?

কিন্তু, যে সুরে ও কথাগুলো বলে তা শুনলে বড়ো কষ্ট হয়। সুহ্‌রার এই বিষণ্ণ মুখ আর ক্লিষ্ট কথাবার্তা মজিদকে বড়ো কষ্ট দেয়। মজিদ বলে—আগের মতো সুহ্‌রার একটু মিষ্টি হাসি দেখতে বড়ো লোভ হয়।

সুহ্‌রা বলে—কেন, আমি কি আগের মতো হাসি না?

—না, আগের মতো তুমি হাসো না। তোমার এখনকার হাসিতে যেন কান্না মেশানো।

—ওঃ সে আমি এখন বড়ো হয়েছি বলে।

একটু পরে বলে—আমরা কত বড়ো হয়ে গেছি।

বড়ো হয়ে গেছ বলে দুঃখও বেড়ে গেছে নাকি? ওরা আগে ছোটো ছিল, ওদের অজান্তে ওরা বড়ো হয়ে গেছে। সুহ্‌রা এখন যুবতী, মজিদ অল্প অল্প গোঁফ ওঠা এক নবীন যুবক।

সুহ্‌রা ওর ভবিষ্যৎকে বড়ো ভয় করে। কোনো দিক দিয়েই ও যেন কোনো আলোর নিশানা দেখতে পায় না। ওর বোন, ওর আম্মা ও—ওরা সব অনাথ। আব্বার মৃত্যুর পর সংসারের সব ভার ওর ঘাড়ে এসে পড়েছে।

ওর এখন ষোল বছর মাত্র বয়স কিন্তু ওকেই এখন ওর পরিবারের সকলের দেখাশোনা করতে হবে। কতকাল আর মজিদের আম্মার সাহায্য নেবে? অন্যের দয়ার ওপর আশ্রয় করে কতদিন বেঁচে থাকা যায়? যদি ও বাড়ির মালিক মজিদ হত তা হলে হয়তো সুহ্‌রার এভাবে সাহায্য নিতে কোনো আপত্তি হত না।

মজিদের আব্বা, আম্মা, ভাই, বোন কারুর সঙ্গেই সুহ্‌রার ঝগড়া নেই। সকলের সঙ্গেই ওর ভাব, কিন্তু মজিদের সঙ্গে ওর যে কি রকম একটা সম্বন্ধ যা কারুর সঙ্গেই নেই। মজিদ অবশ্য ওর সামনে থাকলে ওর অন্য কোনো মনোভাব থাকে না কিন্তু মজিদের অনুপস্থিতিতে এই ভাবটা বেশি জেগে ওঠে। সকালে মজিদের স্কুলে যাওয়া থেকে বিকেল অবধি ওর না ফেরা পর্যন্ত সমস্ত সময়টা সুহ্‌রার একটা অস্বস্তিতে কাটে। মজিদের কোনো অসুখবিসুখ করলে ওর রাতে ঘুম হয় না। সব সময় মজিদের কাছে তখন থাকতে ইচ্ছে হয়। রাতদিন ওকে শুশ্রূষা করতে ইচ্ছে যায়।

যেন ওর মনের ইচ্ছে পূর্ণ করতেই সেবার একটা ঘটনা ঘটল। মজিদের ডান পায়ের তলায় একটা বিষফোঁড়া হল। শহরের স্কুলে পড়তে যাওয়ার চার বছর পর—একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মজিদ পায়ে খুব ব্যথা অনুভব করল। কোনোরকমে লেংচে লেংচে মজিদ বাড়ি ফিরল। পরের দিন পায়ের তলাটা একটু পেকেছে বলে মনে হল। সারা দেহে অসহ্য বেদনা। মজিদ খাটে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। সকলেই বলল ফোঁড়া ফেটে গেলে ব্যথা কমে যাবে, কিন্তু ফোঁড়া ফাটার কোনো লক্ষণ নেই আর মজিদও যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগল।

ওর বাড়িতে সবসময় লোকজন গিস্‌গিস্‌ করছে। লোকজনের ভিড় যখন কম থাকে তখন অবসর বুঝে সুহ্‌রা মজিদের ঘরে ঢোকে। ওর পায়ের ফোঁড়ার কাছটা লাল হয়ে পেকে আছে। সুহ্‌রা সেখানে ফুঁ দেয়। ফোঁড়াটা যেন একটা পাকা হলদে পেয়ারার মতো এত বড়ো। মজিদ এত ব্যথা সহ্য করতে পারে না।

—সুহ্‌রা, আমি শিগগির ইন্তেকাল করব—বলে মজিদ কেঁদে ফেলল।

সুহ্‌রা যে কী বলবে, কী করবে কিছুই ভেবে পেলে না। ওর ভীষণ কান্না পেল। ও মজিদের ডান পায়ের গোড়ালির দিকটা নিজের গালে চেপে ধরল। তারপর ওর পায়ে একটা গাঢ় চুম্বন করল।

প্রথম চুম্বন!

তারপর উঠে মজিদের গরম কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওর মুখের দিকে ওর মুখ নীচু করল। সুহ্‌রার চুল খুলে গিয়ে মজিদের বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ওর নিশ্বাস মজিদের মুখে পড়ছিল। মজিদের সারা দেহের মধ্যে দিয়ে কী যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে মজিদ মুখ তুলল। ওর হাতদুটো সুহ্‌রার গলা জড়িয়ে ধরল তারপর ওর মুখ ওর বুকে চেপে ধরল।

—সুহ্‌রা।

—উঁ।

সুহ্‌রার লাল ছোট্ট ঠোঁট দুটো মজিদের ঠোঁট দুটো চেপে ধরল।

সেই ছোট্টবেলা থেকে ওদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল তা আজ তার সব আবেগ নিয়ে প্রকাশ পেল। ওরা আকুল আগ্রহে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল...দুজন

দুজনকে চুম্বন করতে লাগল শত শত অজস্র, চোখে, মুখে, গালে, কপালে...সমস্ত শরীর ওদের কাঁপছিল। কী যে একটা অপূর্ব সুখ! কী যে একটা অপূর্ব অনুভূতি! কী যে একটা স্বস্তি! কী হোলা?—কী?

—ফোঁড়া ফেটে গেছে—মৃদু হেসে স্বর্গীয় মধুর সংগীতের মতো সুহ্‌রা গুঞ্জন করল।

মজিদ উঠে বসল। অদ্ভুত।...ফোঁড়া ফেটে গেছে। সুহ্‌রার লজ্জিত অবনত প্রেমে ভরা মুখের দিকে মজিদ তাকাল। সেই লাল ঠোঁট দুটোর মাধুর্য, সেই প্রথম চুম্বনের মাদকতা!

ডানপায়ের গোড়ালিতে যেখানে সুহ্‌রা চুম্বন করেছিল সেখানে কী এক অপূর্ব শীতলতা!

সেদিন সারা রাত সুহ্‌রা ঘুমোতে পারল না। সারা শরীর গরম হয়ে উঠছে। সারা শরীর যেন দ্রব হয়ে গেছে। সুহ্‌রা তার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে কিনা, সে লক্ষ্য সফল হবে কিনা সে চিন্তা করতেও ওর ভয় করে।

এর পরের রাতগুলো বেচারার বড়ো অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটতে লাগল।

আট

সুহ্‌রা মজিদকে ভালোবাসে, মজিদও সুহ্‌রাকে। দুজনেই ওরা এ কথা জানে। মজিদ যেন এক স্নেহের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়েছে কিন্তু এই স্নেহের বন্ধনের মধ্যেও ও ওর উঁচু চিন্তা উঁচু আদর্শের কথা ভোলে নি। নিজের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ও খুব সচেতন, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসও প্রচণ্ড। কিন্তু বাড়ির সঙ্গে ওর খুব সম্পর্ক নেই। আম্মা আর ছোটো বোন দুটিকে ও ভালোবাসে কিন্তু আব্বার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ হয়ে গড়ে ওঠে নি। আব্বাকে ও ভালোবাসে কিনা জানে না কিন্তু ভয় করে।

ওর আব্বা এক অদ্ভুত মানুষ। সময় সময় তাকে বড়ো নিষ্ঠুর বলে মজিদের মনে হয়। তিনি কারুর ইচ্ছের ধার ধারেন না। স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাধিপতির মতো তাঁর সমস্ত কাজ। মজিদের কিছু দরকার হলে ও তা আম্মার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। আব্বার গলার স্বর শুনলেই মজিদের ভেতর থেকে একটা প্রতিবাদের ঝড় যেন গর্জে উঠতে থাকে। কিসের যে প্রতিবাদ মজিদ নিজেও তা জানে না। ওর আব্বা তো আব্বার মতো আব্বা। তাঁর সমস্ত কর্তব্যই তিনি করে যাচ্ছেন। মজিদের যা দরকার তার সবই তিনি জোগান দিচ্ছেন। তবু তাঁর দোষটা কি?

কিন্তু নিজের আব্বার চেয়েও ওর সুহ্‌রার আব্বাকে বেশি সম্মান দিতে, বেশি

ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সুহ্রা ওর আব্বাকে ভয় করে নি কোনোদিন। আব্বার কথা বলবার সময় সুহ্রার দু চোখ জলে ভরে যেত। মজিদের আব্বা ইন্তেকাল করলে কি মজিদ ঐ রকম কাঁদতে পারবে? আম্মা ইন্তেকাল করলে অবশ্য ও খুব কাঁদবে।

মজিদের ওর বাড়িতে থাকতে যেন আর একটুও ভালো লাগে না। ও বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটায় নয়তো নিজের ঘরের মধ্যে বসে থাকে। এমনি ভাবে দিন কাটছিল—একদিন একটা খুব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

মজিদ তখন শহরের স্কুলের একেবারে সবচেয়ে ওপরের ক্লাসে পড়ছিল। ধানকাটা শুরু হয়েছে। খুব গরমকাল তার ওপর আবার রোজার সময়। সারাদিন উপোস করে, পানি পর্যন্ত না খেয়ে, সারারাত না ঘুমিয়ে আব্বার মেজাজ হয়ে রয়েছে তিরিক্ষি। সামান্য কারণেই তা জ্বলে উঠছে।

একদিন সকালে মাঠে যাওয়ার আগে আব্বা মজিদকে বললেন—ধান কাটা শেষ হয়েছে। শুকোনোও হয়ে গেছে এখন নৌকো করে নিয়ে আসছে। নৌকোতে যদি কেউ না থাকে তা হলে মাঝিরা পথে বেশ কিছু ধান বিক্রি করে দেবে, তুই তো আর রোজার উপোস করছিস না। স্কুলের পরেই মাঠে চলে আসিস। আসবি, না আসবি না?

মজিদ বলল, আসবে।

কিন্তু মজিদ গেল না। স্কুল থেকে এসে নাস্তা করে রোজকার মতো খেলতে চলে গেল। সন্ধের সময় আব্বাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে মজিদের সব কথা মনে পড়ল। বেশ অন্ধকার হয়ে এলে পর আব্বা বাড়ি ফিরে এলেন। মজিদকে দেখেই আব্বা চীৎকার করে উঠলেন। রাগে দিশেহারা হয়ে প্রথমে মজিদের গালে প্রচণ্ড এক চড় মারলেন। মজিদের মাথা ঘুরে গেল। মাথার মধ্যে যেন শত শত জোনাকির আলো। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আব্বা ওকে দমাদম মারতে লাগলেন।

—এ বাড়িতে থাকতে হলে আমার হুকুম শুনে চলতে হবে নয়তো আপদ এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা এই মুহূর্তে।

মারধোরের শব্দ শুনে আম্মা ছুটে এসে মজিদকে জড়িয়ে ধরল।

—থামো, থামো। ছেলেটাকে যে শেষ করে ফেললে।

আব্বা গর্জন করে উঠলেন—দূর হ হারামজাদী—বলে আব্বা আম্মাকেও মারতে লাগলেন। মাকে মারতে দেখে কাঁদতে কাঁদতে ওর ছোটোবোনেরা ছুটে এলে তারাও খুব মার খেল, তারপর দরজায় ধাক্কা মেরে, বাসনপত্র ছুঁড়ে, কাঁচের গ্লাসগুলো ভেঙে আব্বা একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ করে তুললেন।

মজিদ একটাও কথা না বলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—দূর হ, দূর হয়ে যা। যেখানে খুশি যা। এই মুহূর্তে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে

যা—বলে আব্বা আবার চীৎকার করে মজিদের ঘাড়ে এক ধাক্কা দিয়ে ওকে উঠোনে ফেলে দিলেন। মজিদ উঠোনে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মজিদকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ওর আব্বা আবার চীৎকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, এই মুহূর্তে, এক্ষুনি।

সেই চীৎকার শুনে মজিদের মনে হল যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তে ছুটে বেরিয়ে যায়। ও আস্তে আস্তে ওখান থেকে চলে গিয়ে সদর দরজার কাছে এসে বসল। একফোঁটা চোখের জলও ফেলল না, সব চোখের জল ওর শুকিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে শুধু এই নির্যাতনের প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। সমস্ত মন হু হু করে জ্বলছে। একটা মিষ্টি কথা বলার বা সান্ত্বনা দেওয়ার পর্যন্ত কেউ নেই।

বাড়িতে কী একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। হ্যাজাকের আলোতে বাড়ি ঝলমল করছে কিন্তু তবু সারা বাড়িতে কোনো সাড়া নেই। মৃত্যুর মতো সব স্তব্ধ। শীতল।

এই বিশাল পৃথিবীতে ও একেবারে একা। ওর গ্রাম আর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে মজিদ ঠিক করল, কিন্তু কোথায় যাবে? হাতে একটাও পয়সা নেই, আছে শুধু এই দেহখানি কিন্তু ওকে বাঁচতে হবে। ও যুবক—ওর শরীরে শক্তি আছে। যেখানে হোক্, যেমন করে হোক্ একটা কাজ জোগাড় করে নেবে।

মজিদ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

যাওয়ার আগে সুহ্‌রার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে। সন্ধের অন্ধকারে ওদের সেই একান্ত পরিচিত জায়গায় আমগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

দূর থেকে সুহ্‌রার মিষ্টি স্বর ভেসে আসছিল। কেরোসিনের ডিবির আলোতে সুহ্‌রা বসে কোরান পড়ছিল। একবার কী একটা শব্দ শুনে ও মুখ তুলে আমগাছটার দিকে তাকাল। চোখদুটো ওর নিশ্চল। ডিবির সেই ম্লান আলোতেও ওর ধবধবে ফর্সা গালদুটো জ্বলজ্বল করছিল। ওর লাল ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে বসে থেকে সুহ্‌রা আবার পড়তে লাগল।

—সুহ্‌রা—মজিদ মনে মনে ওকে ডাকল। জোর গলায় একবার ওকে ডাকবে ভাবল, শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য। নাঃ থাক্, দরকার নেই, ওর কষ্ট হবে, ও হয়তো কাঁদবে, ও হয়তো ওকে যেতে দেবে না। মজিদ ওখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল। তারপর হাঁটতে লাগল সোজা। কোনো দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে পাগলের মতো ও গ্রাম ছেড়ে শহরে এল। বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ও হাঁটতে লাগল।

সাত বছর ধরে মজিদ ঘুরে বেড়াতে লাগল। দীর্ঘ সাত বছর। এই সাত বছরে ওর বাড়িতে কী পরিবর্তন এল, সুহ্‌রার কী হল কিছুই ও জানতে পারল না। ও বাড়িতে চিঠিপত্র দেয় নি। মনে ভয় ছিল চিঠিপত্র দিলে হয়তো ওর খোঁজে কেউ আসবে।

ও ঘুরতে লাগল—নানাভাবে ঘুরতে লাগল। কখনও গাড়িতে, কখনও হেঁটে,

কখনও ভিখারীদের সঙ্গে, কখনও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, কখনও হোটেলের চাকর হয়ে, কখনও ছোটোখাটো অফিসের কেরানি হয়ে, কখনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, কখনও কোনো বড়লোকের বাড়ি অতিথি হয়ে। ঘোরার সময় নানা ধর্ম, নানা জাতি, নানা ধরনের লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হল।

টাকাপয়সা জমাতে হবে এরকম একটা ইচ্ছে বিন্দুমাত্রও ওর মনে ছিল না। সুযোগ অনেক এসেছিল টাকাপয়সা রোজগার করার কিন্তু সে সব সুযোগ ও হাতছাড়া হতে দিল। ওর উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেখা আর জানা।

ও অনেক দেখল—ছোটো ছোটো গ্রাম আর বড়ো বড়ো শহর, ছোটো ছোটো ঝর্না আর বড়ো বড়ো নদী, ছোটোছোটো টিপি আর বড়ো বড়ো পাহাড়, কত মাইলের পর মাইল বন্ধুর ভূমি, কত মাইলের পর মাইল উর্বরা শস্যভূমি। এইভাবে হাজার হাজার মাইল ও ভ্রমণ করল। কিন্তু কী দেখার জন্যে? কী শোনার জন্যে?

দেখল মানুষ সব জায়গাতেই এক—শুধু ভাষা আর পোষাকপরিচ্ছদ আলাদা। সব স্ত্রী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, বড়ো হয়, বিবাহ করে, সঙ্গম করে, জন্ম নেয় তারপর মৃত্যু—সব জায়গায় সেই একই দৃশ্য। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে যে দুঃখ সহ্য করতে হয় তা সকলেই করে, কেউ এর থেকে বাদ পড়ে না। মৃত্যুর পর কি সব শেষ হয়ে যায়?

এমনিভাবে অনেক কিছু দেখার পর দীর্ঘ সাত বছর পরে ক্লান্ত বিষণ্নমুখে একদিন ও গ্রামে ফিরল। ওর গ্রামে ফেরার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সুহ্‌রাকে সাদী করে একটা শান্ত সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা।

কিন্তু গ্রামে ফিরে ও যা দেখল আর যা শুনল তাতে ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যবসায়ে আব্বার খুব লোকসান হয়ে গেছে। তার ওপর গ্রামে একটা পোল তৈরি করবার জন্যে সরকারের কাছ থেকে টাকা নেবার জন্যে একটা আবেদনে একটা জোচ্চর লোক আব্বার সই নিয়েছিল। আসলে সেটা ছিল একটা ধারের দলিল—আব্বা ওই লোকটার কাছে এত টাকা ধারে বলে। যে করেই হোক, আব্বার সমস্ত সম্পত্তি দেনায় বিকিয়ে গেছে। বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক রাখা হয়েছে। আম্মা, আব্বা দুজনেই হঠাৎ ভীষণ বুড়িয়ে গেছেন। বোনেদের সাদী হয় নি। তাদের সাদীর বয়স পেরিয়ে গেছে। আর সবার ওপরে যা তাকে কঠিন আঘাত হানল তা হচ্ছে সুহ্‌রার সাদী। মজিদ গ্রামে ফেরার একবছর আগে সুহ্‌রার সাদী হয়ে গেছে শহরের কোন্ এক কসাই-এর সঙ্গে।

সুহ্‌রা মজিদের জন্যে অপেক্ষা করে নি। উঃ মানুষ কি স্বার্থপর!

মজিদ বাড়ি আসার পর গ্রামের লোক সব ভিড় করে ওকে দেখতে এল। চার পাঁচটা কুলি মজিদের বাক্স প্যাঁটরা বয়ে আনছে দেখে গ্রামের লোকেরা ভাবল মজিদ নিশ্চয় অনেক উপায় করে এসেছে। মজিদের বাক্সগুলো অবশ্য সব ছিল বইয়েতে

ভর্তি—হাতে ওর দশটা টাকা মাত্র।

মজিদকে গ্রামের লোক খুব অভ্যর্থনা জানাল। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ওর নিমন্ত্রণ হল। পেটভর্তি করে সকলে ওকে রুটি গোস্ত খাওয়াল।

কিন্তু এক মাসের মধ্যে সব সত্য বেরিয়ে এল। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ঐ পরিবারে মজিদ আর একটি অতি দরিদ্র প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওর আসারই বা কি দরকার ছিল? সাত বছর পরে বাড়ি এল একেবারে খালি হাতে। অদ্ভুত কাণ্ড—গ্রামের লোকে সব বলাবলি করল।

এরপর থেকে মজিদকে গাঁয়ের লোকের শুধু ঠাট্টা টিটকারি শুনতে হল। ও বাড়ির বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিল। বাড়িতে ওর সেই পুরোনো ঘরটিতে ও সবসময় বসে থাকে। এ ঘরটা বহু স্মৃতিবিজড়িত। এই ঘরে ও পড়াশুনো করেছে। এই ঘরেই ওর ছুন্নৎ হয়েছিল। এই ঘরেই পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ও শুয়েছিল। এই ঘরেই বেশির ভাগ সময় ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মজিদ কাটিয়ে দিত।

বাড়িতে ও ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করত না। ওর বোনেরা নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে তার থেকে দড়ি তৈরি করত। ওর আব্বা বাজারে গিয়ে সেই দড়ি বিক্রি করে জিনিসপত্র কিনে আনতেন। খাবার দাবারের বেশির ভাগ আম্মা মজিদকে দিত। আম্মা মজিদকে বড়ো ভালোবাসে। ছেলের কাছে এসে বলে—আহা আমার ছেলেটা আসার পর দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তোকে আমি কত যত্নে মানুষ করেছি রে। তোর রঙ কালো ছিল বলে দুধের সঙ্গে সোনা বেঁটে তোকে খাইয়েছি।

মজিদের কিন্তু কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই। ও কী করবে? হাতে একটাও পয়সা নেই, পয়সা উপায় করারও কোনো রাস্তা নেই। সাহায্য করবারও কেউ নেই।

ভাবনায় চিন্তায় মজিদ দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল। শরীর আর মনকে কিছু একটা কাজে নিযুক্ত রাখার জন্যে ও আবার বাগান তৈরি করতে শুরু করল, এবার অবশ্য একা একা, উঠোন পরিষ্কার করে তাতে সাদা বালি ফেলে চারধারে গাছ পুঁতলো। সুহ্‌রার হাতে পোঁতা জবা ফুলের গাছটা একধারের সীমানা। গাছটা এখন খুব বড়ো হয়ে গেছে। মজিদ যখন ফিরে আসে তখন গাছটা ফুলে ভর্তি ছিল। সবুজ পাতার মতো লাল টকটকে জবাফুলগুলো দেখাচ্ছিল যেন রক্তের ফোঁটার মতো।

মজিদ মাঝে মাঝে এই ফুলগাছটার তলায় আরামকেদারা পেতে একটা বই নিয়ে বসে। বই নিয়ে বসে কিন্তু কিছুই পড়ে না। চুপচাপ অলসভাবে একদিকে তাকিয়ে থাকে। আম্মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে—খোকা, তুই কী এত ভাবছিস?

খুব আস্তে আস্তে মজিদ বলে—কিছু না।

আম্মাও গভীর চিন্তায় ডুবে যায় তারপর নিজের মনে বলে—সবই নসিব।

মজিদকে খুশি করার জন্যে ওর ফুলগাছগুলোতে জল ঢালা নিয়ে ওর বোনেরা

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। ঝগড়ার ফয়সালা করার জন্যে ওরা মজিদের কাছে ছুটে আসে। একসঙ্গে বলে—ভাইসাহেব, আজ আমি তোমার সব গাছে জল ঢেলেছি।

মজিদ বলে—গাছের সব ফুল তোদের দুজনের।

আব্বা বলে, ওর বাগান! বাগানের নিকুচি করেছে। আমার সব টাকা খরচ করে হারামজাদাকে আমি পড়ালাম। সাত বছর পরে বাড়ি ফিরে সম্পত্তি তৈরি করেছে একটা ফুলের বাগান। আমার এই বুড়ো বয়সে আরাম করার জন্যে আমার ছেলে আমার জন্যে ফুলের বাগান করে দিয়েছে। সব আমি উপড়ে ফেলে দেব। বলি শুনতে পাচ্ছ আমি কী বলছি, না শুনতে পাচ্ছ না?

আম্মা বলে, তবু তো উঠোনটা বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

আব্বা শুকনো পানে চুন লাগিয়ে গালে পুরে আবার বলে—আমি যা বললাম তা শুনতে পেয়েছ না—না?

—কি?

—কারুর কাছ থেকে এক ছিলতে তামাক পাতা চেয়ে আনো।

আম্মা পুরোনো ছেঁড়া একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে পাশের বাড়ি থেকে তামাক পাতা ধার করতে বের হয়।

মেঘের মতো কত স্মৃতি মজিদের হৃদয়ের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উড়ে যায়। দারিদ্র্য একটা ভীষণ ব্যাধি। দারিদ্র্য শরীর মন আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। কেমনভাবে নানা ধর্মের, নানা জাতির হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ তাদের হৃদয় তাদের শরীর তাদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে—তা ও দেখেছে।

সেইসব ছবি ওর মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায়, জীবনের কুশ্রীতা আর নগ্নতার ছবিগুলিই বা তার বারবার মনে পড়ে কেন? জীবন তো সৌন্দর্যে ভরা কিন্তু সেই সৌন্দর্যেরও একদিক যে কালিমায় ঢালা তা কখনও সে ভুলতে পারে না। জীবনের মলিনতা, জীবনের কুশ্রীতার ছবি ওর চোখের সামনে বারবার ভিড় করে দাঁড়ায়।

অভুক্ত, নগ্ন, গৃহহীন, অঙ্গহীন হতভাগ্যদের এক অখণ্ড শোভাযাত্রা দিনরাত ওর চোখের সামনে দেখতে পায়। এসব ভুলে যেতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু কী করে ভুলবে? মাথার মধ্যে এই চিন্তাই সবসময় কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে। হৃদয় সব সময় এই চিন্তায় গুমরোচ্ছে।

সুহ্রার কথা মনে পড়লে বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ওর সঙ্গে একবার দেখা হলে বড়ো ভালো হত। ও এখন আর একজনের স্ত্রী। তা হোক, দূর থেকে তাকে একবার ও দেখতে চায়। নাঃ তাকে লজ্জায় ফেলার জন্যে নয়, হুল ফুটিয়ে দেওয়ার কথা বলার জন্যে নয়, শুধু একবার তাকে দেখবে, শুধু একবার তার কথা শুনবে।

সুহ্রা মজিদকে ভুলে গেছে কিন্তু মজিদ কি তাকে ভুলতে পারে? সেই যে

আমগাছটা যা তাদের অনেক স্মৃতির সাক্ষী হয়ে আছে সেই আমগাছটার তলায় রাত্রির নির্জনতায় গিয়ে মজিদ বসে। কারুর অপেক্ষায় নয়। কার অপেক্ষায়? কে আসবে?

মজিদ মনে মনে বলে, আমি এসেছি জানলে সুহ্‌রা আর আসবে না। নাঃ, সুহ্‌রা আর কখনও আসবে না।

নয়

কিন্তু সুহ্‌রা এল। মজিদ এসেছে জানতে পেরে ও হাঁফাতে হাঁফাতে, ছুটতে ছুটতে এল। মজিদ জানতে পারল যে সুহ্‌রা এসেছে কিন্তু মজিদের ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করার সাহস হচ্ছিল না। ও যেন কেমন হয়ে গেল। ওর যেন নড়াচড়া করারও সাধ্য নেই। ও যেন বড়ো ক্লান্ত, বড়ো পরিশ্রান্ত। জীবনের সুর যেন হারিয়ে গেছে।

—কোথায়?—সুহ্‌রার গলা ও শুনতে পেল।

—বাগানে—আম্মা বলছে তাও মজিদ শুনতে পেল। বুকের মধ্যে ওর ধুকধুক করছিল কিন্তু উঠে গিয়ে সুহ্‌রার সঙ্গে দেখা করতে পারল না। অলস, অনড় হয়ে চেয়ারে বসে রইল।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে মজিদের ফুলের বাগান মায়াময় হয়ে হয়ে উঠেছে। ফুলে ফুলে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করছে। বাতাসে একটা মিষ্টি মধুর গন্ধ। গাছের পাতাগুলো সেই মিষ্টি পরশে এদিক ওদিক দুলছে। পড়ন্ত হলদে রোদে নিশ্চল প্রতিমার মতো মজিদ বসেছিল। সুহ্‌রার পদধ্বনি কাছে এগিয়ে আসছে।

—ওঃ নতুন বাগান দেখছি যে...

পেছনে সুহ্‌রার বিষাদে ভরা গলা ও শুনতে পেল। মজিদের বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা করে উঠল। শুধু ব্যথা মাত্র নয়। হৃদয়ের মধ্যে যে কাঁটাটা ফুটে আছে তা যেন এখন খচখচ করছে। হৃদয়ে গুমরে গুমরে উঠছে।

কান্নাভরা বিষাদসুরে খুব আস্তে আস্তে সুহ্‌রা বলল—আমায় চিনতে পারো?

মজিদের চোখদুটো জলে ভরে এল। সুহ্‌রা আবার বলল—তুমি হয়তো আমার ওপর রাগ করেছ।

মজিদ ফিরে দেখল। ওর বুক যেন ফেটে যাবে। একটা কথাও ও বলতে পারল না। সুহ্‌রার এ কী অবস্থা হয়েছে! ওকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। গাল চুপসে গেছে, হাতের নখগুলো ক্ষয়ে গেছে, ওকে বড়ো ক্লান্ত, বড়ো শ্রান্ত দেখাচ্ছে। কানে সোনার দুলের বদলে কালো সুতোগুলো ওর চুলে ঢেকে আছে।

ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলতে পারল না।

সূর্য ক্রমে অস্ত গেল। চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল, ওরা কিছুই

জানতে পারল না। উঁচু টিপিটার পাশ দিয়ে চাঁদ উঁকি মেরে উঠে পড়ল। সারা গ্রামটিকে তার শুভ্র আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে আকাশে উঠে হাসতে লাগল। ওরা তখনও চুপ। সেই নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে দূরে কোথা থেকে যেন একটা প্রেমসংগীত ভেসে আসছিল। কে এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে মনে করে মিষ্টি করুণ সুরে গাইছে—

প্রিয়তম হে তুমি কোথায়
আর রাখিতে নারি আশাদীপ নিভে যায়,
দুরন্ত বায়।

অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই গান সেই অজ্ঞাত গায়ক গাইছিল।

অনেক অনেক পরে মজিদ আস্তে আস্তে গুঞ্জন করল।

—সুহ্‌রা।

অতীতের কোন্ সুদূর হৃদয় গহ্বর থেকে যেন এ আওয়াজ।

—উঁ।

মজিদ জিজ্ঞেস করল—তোমার কি অসুখ করেছিল?

সুহ্‌রা বলল, আমার কিছু হয় নি।

—তা হলে এত রোগা হয়ে গেছ কেন?

তার উত্তরে সুহ্‌রা কিছু বলল না। তার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আমি পরশুদিন মাত্র জানতে পেরেছি যে তুমি এসেছ।

একটু অস্বস্তির সঙ্গে মজিদ জিজ্ঞেস করল, আমি আর ফিরে আসব না তুমি ভেবেছিলে—তাই না?

—সকলেই তাই ভেবেছিল। আমি...

—কি?

—আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তুমি ফিরে আসবে।

—তা হলে তুমি সাদী করলে কেন?

—ওরা সব ঠিক করল। আমার মত কেউ জানতে চায় নি। আম্মা আর পারছিল না। আমার বয়সী মেয়েদের কবে সাদী হয়ে গেছে। সোনা আর পণের টাকা না দিলে কেউ আমাকে...

—সোনা আর পণের টাকা না নিয়ে তোমাকে কেউ সাদী করবে না এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে—তাই না?

—না, আমি তা ভাবি নি। আমি জানতাম এমন একজন আছে যে কিছু না নিয়েই আমাকে সাদী করবে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলি নি, প্রতিটি রাত, প্রতিটি সকাল আমার কান্নায় ভরে গেছে। তোমার যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তোমার যেন কোনো অসুখ বিসুখ না করে খোদার কাছে দিনরাত আমি এই প্রার্থনাই করেছি—রোজ, রোজ...

—আমি তোমাকে ভুলে গেছি তুমি ভেবেছিলে—না?

—না, আমি তা ভাবি নি। কিন্তু তুমি একটা চিঠি পর্যন্ত লেখো নি।

চিঠি অনেকবার লিখেছি কিন্তু পাঠাই নি।

—আমি রোজ চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম। আজ আসবে, কাল আসবে, রোজ তাই ভাবতাম।

—তা হলে সাদী করলে কেন?

—আমি তো তোমায় বললাম আমার সম্মতির অপেক্ষা কেউ করে নি। তারপর আমি কতদিন আমার পরিবারের বোঝা হয়ে থাকব? আমি সামান্য একটা মেয়েমানুষ।

—তারপর?

—তারপর বাড়ি বাঁধা দিয়ে সোনা আর পণের টাকা জোগাড় করে সাদী হল।

—কিন্তু তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন সুহ্‌রা?

—সুহ্‌রা চুপ করে রইল।

—সুহ্‌রা, বলো কেন এত রোগা হয়ে গেছ?

—নানা ভাবনা চিন্তায়।

—কিসের ভাবনা, কিসের চিন্তা, সুহ্‌রা?

—বলো।

সুহ্‌রা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর খুব আস্তে আস্তে ওর স্বামীর কথা মজিদকে বলল—ভীষণ রাগি লোক। তার আর একটা বউ আর দুটো বাচ্চা আছে। বাড়িতে এসে আমার ভাগ চেয়ে নিতে রোজ আমাকে বলবে। আমার আরও ছোটো ছোটো দুটো বোন আছে আমি কি করে ভাগ নিই? আমি 'যাব না' বললে আমাকে মারে। একবার আমার পেটের তলায় এমন মেরেছিল যে আমি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার একটা দাঁত নড়ে গিয়েছিল। এই দেখো।

সুহ্‌রা হাঁ করল, ওর ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলোর মধ্যে একটা কালো দাগ।

—সুহ্‌রা!

—অ্যাঁ?

—তারপর?

—ওখানে যাওয়ার পর থেকে কোনোদিন পেট ভরে খেতে পাই নি। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি মনে শান্তি পাইনি। আমি বউ নই, চাকরানী মাত্র। ছোবড়া পিটিয়ে দড়ি তৈরি করে তাই বিক্রি করে পয়সা আনতে হবে। কম হলে আমাকে মারবে, কিছু খেতে দেবে না। একবার আমার ঋতুর সময়...

—কি?

—একসঙ্গে চারদিন...

—কি?

—চারদিন আমি উপোস করেছিলাম।

এমনিভাবে সুহ্‌রা আস্তে আস্তে সব খুলে বলল। ওর অনেক কিছু বলার ছিল। অনেকদিনের অনেক দুঃখের কথা। অনেকবার ওর ইচ্ছে হয়েছিল আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়োবার—শুধু একটা মাত্র আশা ছিল।

—একবার তোমাকে দেখে মরব।

—মরবে? মরবে কেন সুহ্‌রা? তোমার জীবন তো সবে শুরু সুহ্‌রা। সুহ্‌রা, বিশ্বাস করো তোমার সুদিন আসছে। ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

মজিদের এ কথা শুনে সুহ্‌রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, সুহ্‌রা মজিদের পায়ের কাছে বসেছিল। আবার অনেকক্ষণ একটাও কথা না বলে দুজন চুপচাপ বসে রইল। সারা পৃথিবী চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। একটা 'বউ কথা কও' পাখি করুণ সুরে ডেকে চলেছে। অনেকক্ষণ পরে মজিদ বলল—সুহ্‌রা, যাও গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ো। মনে একটুও দুঃখ রেখো না। যাও, কাল আবার আমাদের দেখা হবে।

—আমি বড়ো ক্লান্ত মজিদ—সুহ্‌রা বলল।

—এত দুর্বল হয়ে গেছ?

—মনে বড়ো কষ্ট, মজিদ।

—তোমার সব দুঃখ কষ্ট আমি ধুয়ে মুছে দেব সুহ্‌রা। যাও, গিয়ে আরাম করে ঘুমোও। আমি আর তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না সুহ্‌রা।

—কাল তুমি কোথাও বেরোচ্ছ?

—না।

—আমি তা হলে সকালেই আসব।

—এসো।

চাঁদের আলোয় ধোওয়া নারকেল গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে সুহ্‌রার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটিও যেন বড়ো করুণ।

হাতে লম্ফ নিয়ে আম্মা এল। চেয়ারে মজিদ চোখ বুজে শুয়ে আছে দেখে আম্মা স্নেহভরে জিজ্ঞেস করল—খোকা, তুই যে এখানে এমনভাবে শুয়ে আছিস?

—এমনি।

—খোকা, সুহ্‌রার অবস্থা দেখলি? আহা গোলাপ ফুলের মতো সুন্দরী মেয়েটা কী হয়ে গেছে। সবই খোদার অভিশাপ।

মজিদ খুব রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওর এই অবস্থার জন্য দায়ী কারা?

—তুই আর এসব ভেবে কি করবি। আয়, এসে দুটো মুখে কিছু দিয়ে শুয়ে পড়। খোদা সব ঠিক করে দেবেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখ।

সে রাতে মজিদ ঘুমোতে পারল না। সুহ্‌রাও ঘুমোলো না। ওদের দুজনের

মাঝখানে উঠোন আর বাগান, দুজনের মাঝখানে দেয়ালের ব্যবধান। দুজনের কেউই জানল না যে দুজনেই জেগে আছে।

দুজনেই ওদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল।

ভবিষ্যৎ...?

দশ

সুহ্‌রার চেহারা আশ্চর্যভাবে বদলে গেল। মনের মধ্যে কী যেন একটু নতুন আলোর রেখা। মুখে রক্তের আভা, চোখ দুটো ওর জ্বলজ্বল করছে। সোজা সিঁথি কেটে কালো কোঁকড়া চুলগুলোকে সুন্দর করে বেঁধে ও যখন ঘুরে বেড়ায় তখন ওর সৌন্দর্য দেখে পাড়ার মেয়েরা সব অবাক হয়ে যায়। তারা বলাবলি করে, সুহ্‌রা এখানে আসার পর থেকে কী সুন্দর হয়েছে দেখতে। এখন শ্বশুরবাড়ি গেলে ওর বর ওকে চিনতেই পারবে না।

ওর বর!

সুহ্‌রা এখন সবসময় মজিদের বাড়িতে থাকে। মজিদের ফুলগাছগুলোয় জল ঢালতে ওর বড়ো ভালো লাগে। এই নিয়ে মজিদের বোনেদের সঙ্গে ওর খুনসুটি লেগে যায়।

মজিদের বোনেরা বলে—এই সব গাছগুলোয় পানি ঢেলে বড়ো করেছি আমরা, সুহ্‌রা তখন জবাফুলের গাছটা দেখিয়ে বলে—আর এটা? এটা কে বড়ো করেছে?

—এটা? এটা তো প্রথম থেকেই এখানে ছিল।

সুহ্‌রা তা শুনে হাসে। সব যে আগের মতো রয়েছে তাই বা কি কম কথা!

একদিন মজিদ ওকে জিজ্ঞেস করল, সুহ্‌রা তুমি এখন কবে যাবে?

সুহ্‌রা ঠিক বুঝতে পারল না। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কোথায়?

—তোমার স্বামীর ঘরে।

—ওঃ—সুহ্‌রার মুখের আলো নিভে এল।

—উনি তো আমায় সাদী করেন নি।

—তা হলে?

—আমার গয়নাগুলো পণের টাকা আর আমার সম্পত্তির ভাগকে সাদী করেছেন। তার মধ্যে টাকা আর সোনাগুলো বেচে খেয়েছেন। এখন বাকী আছে আমার ভাগ। সেটা যে পাবেন না তা তিনি ভালো করেই জানেন।

তারপর একটু আস্তে আস্তে বলল, অবশ্য আমার এখানে থাকাটা যদি কারুর পছন্দ না হয় তা হলে অবশ্য আমি চলে যাব।

—ও রকম একটা জনমত আছে নাকি?

—আছে বলে তো মনে হচ্ছে।

সুহ্‌রা একটা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে তার গন্ধ শুঁকে খোঁপায় গুঁজলো। মজিদ বলল—ঐ জবা ফুলটাই বেশি মানায়।

সুহ্‌রা এ কথা শুনে হাসল কিন্তু হাসলেও ওর সারা মুখে কী যেন একটা বিষণ্ণতা মাখানো রয়েছে।

—এই জবাফুল গাছটা...মনে আছে সেসব কথা?

মজিদ বলল—হ্যাঁ, মনে আছে।

—তা হলে খুব বড়ো একটা একের কথাও মনে আছে বোধহয়।

—হ্যাঁ, এক শাহ্‌জাদী বলেছিল শুনেছি।

দুজনে ওরা খুব কাছাকাছি এলেও মজিদের সেই সাত বছর অজ্ঞাত বাসের কথা সুহ্‌রা কিছুই জানে না। সেসব গোপন কথা জানার জন্যে সুহ্‌রার খুব আগ্রহ। মজিদের জীবনের সব ঘটনার কথা ও জানতে চায়। মজিদের পরিচিত স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধেও ও জানতে চায়। মেয়েদের প্রসঙ্গ এলে ও জিজ্ঞেস করে—কত বয়স তার? রঙ কেমন? সুন্দরী? তার কথা তোমার এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়?

মজিদ ওর প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেয়, ওর মনকে আশ্বাস দেয়, তবু যেন সুহ্‌রার মন সন্তুষ্ট হয় না। মজিদ হয়তো এখনো তার কাছে অনেক কিছু বলে নি, হয়তো এখনও অনেক কিছু গোপন করে রেখেছে।

—শুধু আমাকে...আমাকে...আর কাউকে নয়, প্রতিজ্ঞা করো।

মজিদ হেসে বলে—উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে তো তুমি।

—আর কি ছেলে তুমি!—বলে সুহ্‌রা ভুরু উঁচিয়ে ওকে চিমটি কাটার জন্য এগিয়ে আসে, তারপর মৃদুমৃদু হাসতে থাকে। ওর সাদা ছোট্ট সুন্দর দাঁতগুলোর মধ্যে একটা কালো দাগ, ওর ওই ক্ষয়ে যাওয়া নখগুলো। চিমটি কাটতে এগিয়ে আসা ওর সেই আগেকার রূপ দেখে মজিদের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা শক্ত ঘা লাগে।

—আচ্ছা এই মজিদ আর সুহ্‌রার ব্যাপারটা কি? পাড়ার লোকেরা সব বলতে আরম্ভ করল। পাড়ার লোকের সব জানা চাই। মেয়েটা ওর শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন? খোদা কি এত অনাচার সইবেন?

মজিদ আর সুহ্‌রার এই সম্প্রীতি খোদা সহ্য করবেন না। এ সম্পর্ক অপবিত্র, অশুদ্ধ। আকাশ ভেঙে এক্ষুনি মাথায় পড়বে। হ্যাঁ স্বীকার করি যে ওর বর ওকে ধরে আচ্ছা করে মারে, ওর একটা দাঁতও গেছে কিন্তু হাজার হলেও সে লোকটা ওর স্বামী...

একদিন মজিদ বলল—সুহ্‌রা আমাদের নিয়ে পাড়ার লোকে যে যা তা বলতে আরম্ভ করেছে।

সুহ্‌রা বলল—বলুক গে।

—তা বললে কি হয়। একটু সাবধানে থেকো। হাজার হলেও তুমি মেয়েমানুষ। একটা কলঙ্ক লাগলে...

—লাগুক কলঙ্ক...শুধু আমার দেহে নয়, মনে নয়, কলঙ্ক লাগুক আমার আত্মাতেও। আমার সব কিছুতেই কলঙ্ক লাগুক—আমার কিছু যায় আসে না।

সুহ্‌রার চোখদুটো টল্‌টল্‌ করছিল। মজিদ সুহ্‌রাকে তক্ষুনি কিছু বলতে চাইল না। সুহ্‌রা সম্বন্ধে ও ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু সুহ্‌রাকে কি ভাবে বলবে? ওকে দেবার মজিদের যে কিছুই নেই—না বাড়ি, না সম্পত্তি, না টাকাপয়সা।

মজিদ বলল—সুহ্‌রা, তোমার আর স্বামীর ঘরে যাওয়ার দরকার নেই।

সুহ্‌রা বলল—না, আমি যাব না।

মজিদ আম্মাকে সব বলল। সব শুনে আম্মা অনেকক্ষণ কিছু বলল না। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল যে মজিদ সুহ্‌রাকে সাদী করলে ভালোই কিন্তু মজিদের দু দুটো সাদীর যুগ্যি বোন রয়েছে বাড়িতে। তাদের ফেলে মজিদ সাদী করবে কি করে?

—আমাদের টাকাপয়সা কিছুই নেই তবু মানসম্মান বলে তো কিছু আছে। বোন দুটোকে পার করতে হলে সোনাদানা টাকাপয়সা চাই। খোকা, তুই কোথাও গিয়ে একটা চাকরিবাকরি জোগাড় কর। বোন দুটোর জন্যে দুটো ছেলে দেখ। এই মেয়ে দুটোকে বিদেয় করে আমি তোর সাদী দেব খোকা।

শুধু বর খুঁজে বার করলেই হবে না। সোনাদানা, পণের টাকা সব জোগড় করতে হবে।

মজিদ জিজ্ঞেস করল। পণের টাকা না দিলে কেউ সাদী করবে না?

—কে করবে খোকা? হ্যাঁ কুলিটুলি অথবা ধর্ম বদলানো মুসলমান হয়তো সাদী করতে পারে। কিন্তু আমরা কি সেভাবে সাদী দিতে পারি? আমাদের কানে, হাতে, গলায় কিছু দিয়ে মেয়ে বিদায় করতে হবে।

মজিদের দুই বোনের চার কানে বেয়াল্লিশটা ফুটো আছে। কেন কানে এতগুলো ফুটো করা হয়েছে? গলায়, কানে, হাতে সোনা না পরলেই বা কি হয়? পণপ্রথা না থাকলেই তো হয়।

—আম্মা, এই কানফুটোনো আর অন্যসব আজেবাজে ব্যাপার না থাকলে কত ভালো হত। আমাদের সমাজেই বা কেন এইসব নোংরা ব্যবস্থা। যত নোংরা বেশভূষা, যত নোংরা আচার-ব্যবহার।

আম্মা আর আব্বা একটা কথাও বললেন না। মজিদ আর কিছু বলল না। ওঁদের দোষ দিয়েই বা লাভ কি? ওঁরা ওঁদের বংশের সামাজিক আচারব্যবহার মেনে এসব করেছেন। দরকারী কি অদরকারী এসব তাঁরা ভেবেও দেখেন নি। পুরোনো নিয়মকানুনে একচুল পরিবর্তন আনা মুশকিল অথচ সেই পুরোনো নিয়মকানুন মেনে চলারও যথাযথ অন্তরীক্ষই বা কোথায়?

রাতে মজিদের চোখে ঘুম নেই। সব সময় ও ভাবছে। বোনেদের সাদী দিতে হবে। ওদের এখন পূর্ণ যৌবন—মনে ওদের কত আশা, কত অভিলাষ। ওদের ভালো খাওয়া নেই, পরার ভালো কাপড়চোপড় নেই। মানুষ বড়ো দুর্বল, কখন কোন পথে সে পা বাড়ায় কেউ কিছু বলতে পারে না।

মজিদের ভীষণ অস্বস্তি লাগতে লাগল। কত কি যে ওর করার আছে। এগুলো করতে পারলে খুবই ভালো হত। বাড়ির দেনা সব শোধ করতে হবে, বোনেদের সাদী দিতে হবে। আম্মা আব্বার পছন্দমতো কিছু করতে হবে। তাঁরা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। কবে যে ইন্তেকাল করবেন তার কিছুই বলা যায় না। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাঁদের জীবন আনন্দে ভরিয়ে তোলা ওর কর্তব্য।

সুহ্‌রাকে সাদী করবে। তারপর তার দুই বোন আছে, আম্মা আছে। তাদের জন্যেও কিছু করতে হবে। কিন্তু কী করতে পারে ও, সব কিছুতেই লাগে পয়সা। যদি কিছু আরম্ভ করে দিতে পারত তা হলে ঠিকমতো চালিয়েও নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আরম্ভ করাটাই তো মুশকিল। হাতে পয়সাকড়ি নেই। সাহায্য করারও কেউ নেই। এরকম অবস্থায় কে কী করতে পারে?

তবে ওর আম্মার মত একেবারে অন্যরকম। দূরে শহরে—অনেক উদারচেতা মুসলমান ধনিকেরা বাস করে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অনেক কিছুই করে থাকে। নিরাশ্রয় যুবতীদের সাদী দেয়, কর্মহীন লোকদের চাকুরি দেয়। তারা বিনাবেতনের স্কুল খোলে, অঙ্গহীন, নিরাশ্রয় লোকদের জন্য অনাথ আশ্রম খোলে—এমনভাবে তারা অনেক উপকার করে।

আম্মা বলল—আমাদের কথা গিয়ে ওদের একবার বল না। তারপর ওরা সব ঠিক করে দেবে। আমার ঠিক বিশ্বাস। ওই ফকির আমাকে সব বলেছে।

এক ফকির আম্মাকে এইসব বলেছে। অন্য জায়গার ধনী মুসলমানেরা উদার শিরোমণি সব।

মনে বেশ কিছু দ্বিধা আর আশঙ্কা নিয়ে মজিদ বেরিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হল। কোথাও গিয়ে কিছু একটা খুঁজে বের করতে হবে। যেকোনো একটা কাজ।

—আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব—মজিদ সুহ্‌রাকে বলল—আমি সকলের ভার তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

—তোমার ফিরে আসা অবধি আমি ওদের সকলের দেখাশোনা করব।—সুহ্‌রা ভার নিল।

মজিদের মনের ভার খানিকটা লাঘব হল। ও যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল।

এক সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমদিগন্তে সোনারঙের মেঘগুলো যখন ছুটে ছুটে খেলা করছে তখন মজিদ রওনা দিল। ওর স্যুটকেস আর বিছানা নিয়ে একটা কুলি বাসস্ট্যাণ্ডে চলল। মজিদ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল। ওর আব্বা ওকে বলল, আমি চোখে

আজকাল একটুও দেখতে পাই না, তুই আসার সময় আমার জন্যে একজোড়া চশমা কিনে আনিস। আনবি তো—না—না?

—কিনে আনব—বলে মজিদ ওর ঘরে ঢুকল। চোখভরা অশ্রু নিয়ে সুহ্‌রা জানলার কাছে উৎকণ্ঠা ভরে দাঁড়িয়েছিল।

—একটা কথা বলি, সুহ্‌রা বলল।

মজিদ মৃদু হেসে বলল—বলো শাহ্‌জাদী, বলো।

—বলছি কি...

ও কথা শেষ করবার আগেই বাসের হর্ন বেজে উঠল। আম্মা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—খোকা, তাড়াতাড়ি যা, বাস ছেড়ে দেবে।

মজিদ বের হবে ভাবল। সুহ্‌রার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছিল।

মজিদ জিজ্ঞেস করলো—আসি তা হলে?

সুহ্‌রা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে ওর সম্মতি জানাল।

মজিদ এক অজানা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াল। সদর দরজার কাছে পৌঁছে পেছন ফিরে দেখে সুহ্‌রার ছবি আর ওর বাড়ির ছবি। দুটো ছবিই যেন এক হয়ে গেছে। এই দুই ছবি এক হয়ে ওর হৃদয়ের মণিকোঠায় অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। এরপর বহুদিন ধরে ওর চোখের সামনে এই দুই ছবি এক হয়ে ভেসে উঠলে লাগল।

এগার

সুহ্‌রাকে সাদী করবে। তার আগে বোনেদের সাদী দিতে হবে। তার আগে গয়না আর পণের টাকা জোগাড় করতে হবে। একটা কাজ চাই কিন্তু কাজ কোথায়? কাজ কোথাও নেই। আর যদিও বা থাকে তার সুপারিশ না করলে অথবা ঘুষ না দিলে পাওয়া যায় না। পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটও চাই। এসব না হলে কাজ পাওয়া অত সহজ নয়। মজিদ অনেক খুঁজল, শহরে অনেক জায়গায় দিনের পর দিন চাকরির আশায় ঘুরে বেড়াল, শেষে ওর জন্মভূমি থেকে দেড়হাজার মাইল দূরে এক মহানগরে গিয়ে পৌঁছোলো। এর মধ্যে প্রায় চারমাস কেটে গেছে।

এখানে ওর একটা কাজ জুটল—কাজ খুব কঠিন নয়। অনেক উপায় করা যাবে যদি দিনরাত অবিশ্রান্ত খাটতে পারে। চল্লিশ পার্সেন্ট কমিশন পাবে, কোম্পানির ম্যানেজার নিজে কথা দিলেন। কোম্পানির সাইকেলও আছে। সাইকেলে করে স্যাম্পেল নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে অর্ডার জোগাড় করতে হবে। কোম্পানি থাকার জায়গাও দেবে।

মজিদ কাজ আরম্ভ করল। ছোট্ট একটা ঝোলানো স্যুটকেসে স্যাম্পেল আর অর্ডার বই নিয়ে ও কাজে বেরোয়। সারা শহর ঘুরে অর্ডার নিয়ে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে আসে খুশিমনে।

এমনিভাবে একমাস কেটে গেল, ওর সব খরচ চালিয়ে বাড়িতে একশোটা টাকাও পাঠাল। আব্বাকে একটা চশমা। সুহ্‌রা আর মজিদের বোনেদের জন্য কিছু জামাকাপড় কেনার আলাদা টাকাও পাঠাল। আরও একমাস কাটল।

ভবিষ্যতে যে কী হবে তা কেউ কিছু জানে না কিন্তু কেউ খারাপটার প্রত্যাশা করে না। মজিদও করে নি, তবু অপ্রত্যাশিত ভাবে খুব একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

সেদিন ছিল সোমবার—মজিদের স্পষ্ট মনে আছে। ভরা দুপুরবেলা। রোজকার মতো স্যুটকেসটা সাইকেলের আলোর জায়গাটায় ঝুলিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি পিচঢালা পথে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। বেশ ঢালু পথ—আর ও বেশ জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিল। স্যুটকেসটা সরতে সরতে ওর হ্যাণ্ডেলটা খুলে গেল। স্যুটকেসটা সাইকেলের চাকায় আটকে গেল। মজিদ সাইকেল থেকে ছিটকে জড়ো করা লোহালক্কড়ের মধ্যে পড়ল।

দেহেতে যেন একটা পাহাড় ভেঙে পড়েছে এত ব্যথা। কী যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—সে যে কী অসহ্য ব্যথা। দেহের সবটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার, বিস্মৃতির ঘন অন্ধকার। ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎ চমকের মতো মাঝে অনুভূতির আলো ঝিলিক দিয়ে উঠত আর তখন সারা দেহে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করত। ওষুধের একটা রুক্ষ গন্ধ, লোকের আর্ত চীৎকার—গলার মধ্যে দিয়ে টিউবের মতো কী যেন একটা ঢোকানো—পেটে গরম তরল পদার্থে ভরে যাচ্ছে। এমনিভাবে যেন কতযুগ কেটে গেল।

কিছুই মনে পড়ছে না, কিছুই স্পষ্ট নয়, ওর স্মরণশক্তি যেন সাদা ধোঁয়ার মতো। সাদা মেঘের মতো স্মৃতিগুলো দূর থেকে দূরে ভেসে চলে যাচ্ছে। সবকিছু কি তা হলে বিস্মৃতির মধ্যে লয় হয়ে যাবে নাকি? ও কি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাবে?

নাঃ ওকে পাগল হলে হবে না। ওকে বাঁচতে হবে। জীবন বড়ো রুক্ষ বড়ো কঠিন তবু ওকে বাঁচতে হবে। মজিদ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। বিস্মৃতির যে বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী ওকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিল ও ওর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল...আবার...আবার ব্যথাটা জেগে উঠছে।

সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে মজিদ চোখদুটো খুলল। লম্বা বিছানা, গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। হাসপাতাল...ওর সব মনে এল।

অতি তীব্র, অতি ভয়ংকর ব্যথা। ডানদিকের কোমরে যেন আগুনের জ্বালা—সারা শরীর, এমন কি, মাথা পর্যন্ত ব্যথা, ও একবার হাত দিয়ে কোমরটা স্পর্শ করল। কোমরে খুব ভারী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

মজিদ ডান পায়ে একবার হাত দিল ওর হাড়পাঁজরার মাঝ দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস যেন বয়ে গেল। শূন্য ওখানে...কিছু নেই। মজিদ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে ও ঘেমে উঠল, মনে হল এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। চিরদিনের মতো ওর ডান পায়ের অর্ধেকটা কাটা পড়েছে। ও যেন একটা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। সারা পৃথিবীটা ওর চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে।

ও আবার হাত দিয়ে দেখল। কিছু নেই, নীচের দিকটা কিছু নেই। অসহ্য বেদনা...সুহ্‌রার প্রথম চুম্বনে ছোঁয়া ডান পা...কোথায় গেল পাটা?

চোখদুটো ওর খোলা ছিল—গরম অশ্রুজল ওর গাল দিয়ে বুকের ওপর ঝড়ে পড়ছিল। ওর বিছানার কাছে ডাক্তার, নার্স আর কোম্পানির ম্যানেজার। মজিদের কপালে ঠাণ্ডা হাত রেখে কোম্পানির ম্যানেজার নিচু হয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন—মিঃ মজিদ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি কষ্ট পাবেন না।

—সুহ্‌রা?

—কি মজিদ?

—তুমি কিছু বলছ না যে?

—বাঃ আমি তো সায় দিচ্ছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

—'সুহ্‌রা'—চীৎকার করে ডেকে ও চমকে জেগে উঠল।

—সকালে স্বপ্ন দেখছেন নাকি। নার্স জিজ্ঞেস করল। মজিদ মৃদু হাসার চেষ্টা করল।

চৌষট্টিটা সকাল আর চৌষট্টিটা রাত কাটল। ওর চেয়েও উঁচু একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে ও কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে হাসপাতাল ছেড়ে রাস্তায় বেরোলো। মজিদের হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে ম্যানেজার বললেন—আপনি এখন বাড়ি যান। এরকম দুর্ঘটনা ঘটাতে আমি সত্যিই দুঃখিত।

এই সহানুভূতিতে মজিদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ও বলল—আমার বোনেদের সাদীর বয়স হয়ে গিয়েছে' আমার আম্মা, আব্বা বুড়ো হয়েছেন। সম্পত্তি যা ছিল তা সব এখন বাঁধা। বাড়িতে ছেলে বলতে আমি একা। বাড়ির দুঃখকষ্ট দূর করতে বেরিয়েছিলাম। তা দূর না করে আমার বাড়ি ফেরার একেবারেই ইচ্ছে নেই। তারপর এই অবস্থায় আমি বাড়ি গিয়ে সকলের ওপর একটা বোঝা হয়ে থাকতে চাই না।

—তা হলে আপনি এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?

—জানি না কি করব।

—আমার কোম্পানিতে আপনার যোগ্য কাজ—আপনি কেরানির কাজ করতে রাজী আছেন?

—পারব না, আমি অঙ্কে খুব কাঁচা।

এমনিভাবে মজিদ আবার এ বিশাল পৃথিবীতে একা পড়ল।

ম্যানেজারের দেওয়া পঞ্চাশটা টাকা থেকে ও চল্লিশটা টাকা বাড়িতে পাঠাল, তার সঙ্গে একটা চিঠিও। ওর ডান পায়ের অর্ধেকটা যে কাটা গেছে সে সম্বন্ধে কিছু লিখল না। লিখল—অসুখ করেছিল তাই এতদিন চিঠিপত্র লিখতে পারে নি। ওর পরের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত ওকে যেন কোনো চিঠিপত্র দেওয়া না হয়।

মজিদ আবার কাজ খুঁজতে লাগল। দুই হাত ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে এক পা লেংচে লেংচে ও কাজের সন্ধানে ঘুরতে লাগল। বেশিদূর একসঙ্গে যেতে পারে না, একটু হাঁটে আবার থামে। থামতে থামতে ভাবে আবার হাঁটে। এমনিভাবে দু একমাস কেটে গেল। থাকার একটা জায়গা নেই যেখানে জায়গা পায় সেখানেই ঘুমোয়।

শেষে শহরের কোনো ধনী মুসলমানের কাছে সাহায্য চাইবে ভাবল। খোঁজ নিয়ে জানল খানবাহাদুর নামে এক ভদ্রলোক হচ্ছেন সে শহরের সবচেয়ে ধনী মুসলমান। তিনি খুব দানশীল আর উদারচেতাও বটে। শহরের সমস্ত বড়ো বড়ো বাড়িগুলো তাঁর। লোকে বলে তাঁর টাকায় নাকি ছাতা পড়ে যাচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের ওপরও তাঁর নাকি খুব প্রভাব। সম্প্রতি তিনি দশ হাজার টাকা খরচ করে গভর্ণরকে একটা বিরাট ভোজ দিয়েছেন। তিনি চাইলে সব পারেন—সব।

মজিদ এই ধনিকটির কাছে সাহায্য চাইতে গেল কিন্তু ধনিকের দারোয়ান মজিদকে ভেতরে ঢুকতে দিল না। রোজ মজিদ এসে সেই বিরাট অট্টালিকার গেটে দাঁড়িয়ে থাকে আর রোজই তাকে দারোয়ান ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানের দয়া হল। মজিদকে খানবাহাদুরের সামনে নিয়ে আসা হল। মজিদ তার সেলাম জানাল। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে সাধারণতঃ 'সেলাম আলেকুম' বলে সম্বোধন করে। মজিদ তাই সেলাম জানাল কিন্তু খানবাহাদুর কি জন্যে কে জানে ফেরত সেলাম জানালেন না। মজিদের সেলাম সম্বোধন তিনি যেন শুনতেই পান নি এমন ভাব দেখালেন। খানবাহাদুরের বয়স পঞ্চাশ হবে, ফর্সা গোলগাল মানুষটি। তাঁর হাতের সোনার আংটিগুলো থেকে দামী পাথরগুলো ঝিকমিক করছিল। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি মজিদের দুঃখের কথা শুনলেন। শেষে বললেন,—আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক স্ত্রীলোক আছে যাদের বিয়ে হয় নি। দুটো ভাত জোটে না এমন অনেক লোকও আছে। আমার যা সাধ্য আমি তা করছি। তুমিই বলো এর বেশি আমি কী করতে পারি?

মজিদ চুপ করে রইল।

খানবাহাদুর তখন তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেদের উন্নতির জন্য কী কী করেছেন তার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন। চারটি মসজিদ স্থাপন করেছেন, তার ওপর স্কুল করার জন্য তিনি কিছু জায়গাও দিয়েছেন। এই জায়গায় বাড়ি করে ভাড়া দিলে তিনি তো অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি জায়গা সমাজকে

দান করেছেন। নিজের সম্প্রদায়ের লোকের জন্য বছরে তাঁর কত টাকা তা হলে লোকসান যাচ্ছে মজিদ ভেবে দেখুক।

—এর বেশি আমি আর কী করতে পারি বলো?

মজিদ কিছু বলল না।

মজিদের একটা পা খোয়া গেছে দেখে খানবাহাদুর সহানুভূতি জানালেন। বললেন,—সবই নসীব। নইলে কী আর বলব।

মজিদ চুপ করে রইল।

মজিদ তার ক্রাচ নিয়ে আর হৃদয়ভরা ব্যথা নিয়ে সেলাম জানিয়ে ফিরে চলল। ও যখন গেট পেরিয়েছে তখন খানবাহাদুর একজন ভৃত্যের হাত দিয়ে ওকে একটা টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

—টাকাটা তুমি নাও। খানবাহাদুরকে বোলো যে আমাকে দিয়েছ—মজিদ ভৃত্যটিকে বলল।

মজিদ কেন ঐ টাকাটা নিল না? ঐ কোটিপতির কাছে প্রতিদিন হাজার হাজার গরিব লোক উপস্থিত হয় তাদের সকলকেই তাঁকে কিছু না কিছু দিতে হয়। মজিদ কোটিপতি হত তা হলে ও কী করত? প্রথম যে গরিব লোকটি এসে ওর কাছে সাহায্য চাইত তাকে ওর অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিত নাকি? খানবাহাদুর একটা টাকা দিয়েছেন সেটা কি তার নেওয়া উচিত ছিল না? এ দুনিয়ায় বড়োলোক আর কজন? সবই তো গরিব। মজিদ কি তা হলে টাকাটা না নিয়ে অন্যায় করল?

হাঁটতে হাঁটতে মজিদের ক্রাচের চার ইঞ্চি ক্ষয়ে গেল। অনাহারে, অনিদ্রায় দেহ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ল। অবশেষে মজিদ একটা কাজ পেল। একটা হোটেলে এঁটো বাসনপত্র ধোয়ার কাজ। ভোর চারটে থেকে রাত এগারোটা অবধি কলের কাছে থাকতে হয়। বড়ো একটা ঝুড়িতে করে বাসন এনে ওর সামনে রাখা হয়। ও সেগুলো একটা একটা করে ধুয়ে আর একটা ঝুড়িতে রাখে। সে ঝুড়িটা একজন নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন আর একটা ঝুড়িতে করে আর এক গোছা এঁটো বাসন নিয়ে আসে। এমনিভাবে অবিশ্রান্ত কাজ। তবু পেট ভর্তি খাওয়া পাওয়া যায় আর বাড়িতেও ও মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা পাঠাতেও পারল।

অনেকদিন পরে বাড়ি থেকে প্রথম চিঠি পেল ও। আম্মার জবানে সুহ্‌রার হাতে লেখা। সুহ্‌রার শরীরটা ভালো নেই। ও খুব রোগা হয়ে গেছে সঙ্গে কাশিও। এ বাড়ির সকলে ভালো আছে। মজিদ কবে বাড়ি আসবে। সঙ্গে দুলাইন সুহ্‌রার জবানবন্দীতে—এখানে সকলে ভালো আছে। তোমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

তোমার সুহ্‌রা।

বার

মজিদেরও বড়ো ইচ্ছে সুহ্রাকে দেখতে, দেড়হাজার মাইল দূরে বসে মজিদ সুহ্রাকে দেখে। ওর কাশির শব্দ শুনতে পায়, ওকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেয়।

—সুহ্রা এখন তুমি কেমন আছ? তোমার বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

রাতে শুতে যাবার সময় সুহ্রাকে সান্ত্বনা দেয়—ঘুমোও আমার বন্ধু, ঘুমোও।

এমনিভাবে কিছুদিন কাটার পর আর—একটা চিঠি এল। চিঠিটা সুহ্রার হাতে লেখা নয়। কাকে দিয়ে যেন আম্মা লিখিয়েছে। চিঠিটা পড়ে মজিদের মনে হল যেন নগরের সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আমার খোকা,

পরশুদিন সকালে আমাদের সুহ্রা চিরদিনের জন্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ওদের বাড়িতে, আমার কোলে মাথা রেখে ও চলে গেল। আমাদের সকলের একটা খুব বড়ো ভরসা ছিল সুহ্রা। এখন তুইই আমাদের একমাত্র ভরসা।

খোকা, গত মাসের তিরিশে আমাদের বাড়ি বাগান বন্ধকীরা নিয়ে নিয়েছে। ওরা আমাদের এ বাড়ি থেকে উঠে যেতে বলেছে। খোকা, এই দুটো সোমত্ত মেয়ে আর তোর অসুস্থ আব্বাকে নিয়ে কোথায় যাব?

খোকা, রাতে আমার ঘুম হয় না। তোর বোনের বয়সী মেয়েরা আজ তিন চার ছেলের আম্মা। যদি কোনো কিছু খারাপ ঘটে...

খোকা, এখানকার লোকগুলো যে কি পাজী তা আর আমি তোকে কি বলব। আমি আর তোর আব্বা অনেক বলেছি কিন্তু বাড়ি যাদের কাছে বন্ধক ছিল তারা একটা কথাও শুনছে না। তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আমাদের ধর্মের অনেক বড়োলোক তো ওখানে আছে। তুই যদি তাদের কাউকে বলিস তা হলে কি তারা একটা উপায় করে দেবে না?

খোকা, সুহ্রার কথা মনে পড়ে বড়ো কষ্ট হয়। আমাদের যে কত বড়ো একটা আশ্রয় ছিল। বেচারা দু মাস বিছানায় পড়েছিল—যক্ষ্মা। ইন্তেকাল করার আগে খুব তোর নাম করছিল। বারবার জিজ্ঞেস করছিল তুই এসেছিস কিনা। সবই খোদার অভিশাপ।

চিঠি পড়া শেষ হলে সুহ্রার সবচেয়ে শেষের চিঠিটা মজিদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। নির্জন, নিস্তব্ধ এক বিশাল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত পাথরের প্রতিমার মতো নিশ্চল হয়ে বসে মজিদ ভাবছিল...সুহ্রার জীবনগ্রন্থের প্রতিটি পাতার কথা, প্রথম থেকে শেষ অবধি। এত তাড়তাড়ি সব শেষ হয়ে গেল?

সেদিন সুহ্রার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সুহ্রা যেন কী বলতে চেয়েছিল। সবটা বলার আগেই মজিদ ঘরের ভেতর থেকে বাসের হর্ন শুনতে পেল। আম্মা

দরজার কাছে এল...ও বাইরে বেরিয়ে এল। গেট পেরিয়ে একবার ফিরে দেখল।

পশ্চিম দিগন্তে সোনা মাখানো মেঘ। গাছপালা, বাড়িঘর সব সোনালি রঙে ডুবে গেছে।

বোনেরা দুজন মুখ বাড়িয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আব্বা দেয়ালে হেলান দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে...আম্মা উঠোনে আর সুহ্‌রা সেই জবাফুলগাছটা ধরে বাগানে দাঁড়িয়ে আছে, দুচোখ ভরা জল নিয়ে।

যা বলতে চেয়েছিল তা হয়তো তখনও ওর ঠোঁটে ছিল। সুহ্‌রা কী বলতে চেয়েছিল?

□

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, Paharganj, New Delhi-110 055 and
printed at Beauty Print, Paharganj, New Delhi-110 055